কিশোর-কিশোরীদের

বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা ও সমাধান

অসীম বর্ধন

bengaliboi.com

কিশোর-কিশোরীদের বঃয়সন্ধিক্ষণের সমস্যা ও সমাধান

মূল ঃ অসীম বর্ধন
পুনরীক্ষণ ঃ সুমন চৌধুরী

বর্তমান সময়

কিশোর-কিশোরীদের
বঃয়সন্ধিক্ষণের সমস্যা ও সমাধান

❑

সুমন চৌধুরী

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২; মাঘ ১৪০৮

বর্তমান সময়

প্রকাশক ঃ ইফতেখার হোসেন রোমান
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (তিনতলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন-৭১২২৯৪৫

কম্পোজ ঃ হৃদয় কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (তিনতলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ছাপা ঃ এস. আর. প্রিন্টিং হাউস, ঢাকা-১১০০।

Kishore kishorider Boyo
Shandhikhaner Samasha O Samadan
By Suman Chowdhyry
Publisher : **BARTAMAN SOMAY**
34 North Brook Hall Road (2nd Floor)
Banglabazar, Dhaka-1100 ❑ Tel : 880-2-7122945

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র।
Price : Taka 70.00/ Dollar : US 2

ভূমিকা

আমাদের কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা **যৌনজ্ঞান** প্রশ্নে বা বিষয়ে সংরক্ষণশীলতা অবলম্বন করে থাকে। আবার উদ্দাম যৌন আবেগে তারা দিবাস্বপ্নে আছন্ন হয়ে অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা করে। এসবই সমাজ চিন্তা-ভাবনার পরিবেশের অংশ। আজ সমাজ-চিন্তার ফসল হচ্ছে **কুড়িতে মা হও** এক সময়ে যা ছিলো **কুড়িতে মেয়েরা বুড়ি**।

সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবীদ ও বিজ্ঞানীরা মনে করেন কিশোর বয়সে যৌনতার উন্মেষ যথাযথ ভাবে সুপথে সঞ্চালিত না হলে তাদের প্রাণশক্তি বিভ্রান্ত হতেই পারে এবং তার ফলে ব্যাপক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্যে, সমাজে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার লক্ষ্যে সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতামত নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার তার মানব সম্পদ উন্নয়ন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যথাপোযোগী করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যৌন বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়। যাকে অনেকেই স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ বলে থাকেন। যা আমাদের দেশে এখনও হয়ে ওঠেনি।

ফলে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা উন্মেষকালে সুশিক্ষার অভাবে তাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। যখন বিষয়টি অভিভাবকদের বোধগম্য হয়, তখন আর সময় থাকে না, কারণ বিষবৃক্ষে ফল ধরে গেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও সমাজে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা উন্মেষকালে তাদেরকে সৃজনশীল চিন্তায় ধরে রাখার জন্য ও অভিভাবকদের আধুনিক চিন্তার লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যে নানা বই, পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী ভাবে যা অভিভাবক এবং কিশোর-কিশোরীরাও পড়তে পারেন বা পড়েন।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সমাজ মনোবিজ্ঞান বিষয়ক লেখক অসীম বর্ধন কিশোর-কিশোরীদের যৌন সমস্যা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। বইটি অভিভাবক ও কিশোর সন্তানদের খুবই প্রয়োজন এবং সমাজের জন্য কল্যাণকরণ কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীল চিন্তা বিকাশের সহায়তায় বাংলাদেশের উপযোগী করে নাম রাখা হয়েছে "কিশোর কিশোরীদের বঃয়সন্ধিক্ষনের সমস্যা ও সমাধান"। এটি অসীম বর্ধন-এর "কিশোর-কিশোরীদের যৌন সমস্যা" বইটির পুনরীক্ষণ। আমরা অসীম বর্ধন-এর নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণি। আমরা আশাকরি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে এবং পাঠকরা অসীম বর্ধনকে ধন্যবাদ জানাবেন।

সুমন চৌধুরী
১ অক্টোবর ২০০১ ঢাকা।

সূচিপত্র

কৈশোরের বিকাশধারা	৭
শারীরিক বিকাশ	১১
শারীরিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা	১৩
মানসিক বিকাশ	১৫
সামাজিক বিকাশ	১৭
বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব	২০
মেয়েদের রজঃস্রাব	৩০
কিশোর বয়সে যৌন ধারণা	৩৫
কৈশোর যৌনচর্চার সূচনা	৪০
স্বমেহনের কার্যকারণ	৪১
কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণবোধ	৪৭
কৈশোরে প্রেম, ভালবাসা ও বিবাহ-ধারণার গুরুত্ব	৫০
কৈশোরে যৌন আচরণের গতি-প্রকৃতি	৬২
নীতিবোধ বদলাচ্ছে	৬৪
কিশোর-কিশোরীদের কাঁধেই যত দোষ	৬৭
যৌন পবিত্রতা সম্পর্কে সহজ চিন্তা	৬৮
কৈশোরে জন্মতত্ত্ব ও জন্ম নিরোধের ধারণা	৭০
কিভাবে সন্তান জন্মে	৭৯
নলজাতক শিশু	৮১
নিরাপদ সময়	৮২
যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে কৈশোরে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও আচরণ সমস্যা	৮৬
শারীরিক ব্যায়ামের ভূমিকা	৯৩
যৌন ব্যধি ও তার প্রতিরোধ	৯৪
মা-বাবা শিক্ষকদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা	৯৭
যৌন শিক্ষার প্রয়োজন ও পরিণাম	১০০
প্রচার মাধ্যমগুলোর ভূমিকা	১০৫
সমাজের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব	১০৮

কৈশোরের বিকাশধারা

বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিকে আমাদের প্রথম থেকেই সংক্ষেপে অথচ সম্যক্‌ভাবে বুঝে নিতে হবে। একটি চঞ্চল দুরন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অপরিণত শিশু কেমনভাবে সুস্পষ্ট বিকাশের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে হয়ে ওঠে ধীর-স্থির সুবিবেচনাসম্পন্ন বলিষ্ঠ মানুষ, সেই সংঘাতময় প্রক্রিয়া অনুধাবন করলে অপরিসীম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতেই হয়।

শৈশব থেকে বাল্যকাল ও পৌগণ্ডের পর্যায় অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিয়ে কিভাবে মানুষ বয়স্ক হয়ে ওঠে, তার ভারি সুন্দর ক্রমবিন্যাস প্রক্রিয়া বহুকাল আগে বিশিষ্ট মনঃসমীক্ষক ডাঃ আরনেস্‌ট জোন্‌স সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক মূল্যবান গবেষণামূলক নিবন্ধে।

ডাঃ জোনসের মতে, মানুষের বিকাশের চারটি সুবিন্যস্ত স্তর বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়, তা হল– পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশব; বাল্যকাল বা পৌগণ্ড বারো বছর বয়স অবধি; কৈশোর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত এবং অবশেষে আসে পূর্ণ বয়স্ক পর্যায়।

জোন্স সাহেব এ কথাও আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, আমরা ঠিক যেন দুবার বড় হই!– কথাটা শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও, তিনি ব্যাপারটা এভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, প্রকৃতি যেন তাঁর পূর্ব পর্যায়ের বিকাশ ধারালব্ধ সব কিছু নস্যাৎ করে দিয়ে, আবার নবোদ্যমে একটি জীবনের চারিত্রিক পুণর্গঠন শুরু করার আনন্দে মেতে ওঠেন এই কৈশোর পর্যায়ে।

তাঁর প্রতিবাদ্য বিষয় এবং মূল বক্তব্য ছিল এই, আনুমানিক বারো বছর বয়স থেকে পূর্ণ বয়স্ক পর্যায়ে পৌছানো পর্যন্ত, ছোটদের প্রক্ষোভ-জীবনের বিকাশধারার সঙ্গে, তাদের জন্মের প্রথম বারো বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ববর্তী বিকাশের বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে যেমন প্রথম শৈশব থেকে পরবর্তী শৈশবাবস্থার আবির্ভাব হয়, তেমনি দ্বিতীয় পর্যায়েও কৈশোরের চঞ্চলতা এবং উদ্দামতার পরে পূর্ণবয়স্ক পর্যায়ের সংহত শান্ত ভাবটি আসে।

ডাঃ আরনেস্‌ট জোনসের যে মতবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে, মানব জীবনের বিকাশধারার মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই মতবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান সম্ভবত এইটাই যে, কৈশোর এবং পূর্ণবয়স্ক পর্যায়ে দুটি যথাক্রমে শৈশব এবং বাল্যকাল পর্যায় দুটিরই বিস্ময়কর পূনর্বৃত্তি (রিক্যাপিচুলেশ্যন্‌) বলেই প্রতীয়মান হয়ে থাকে–মানুষ প্রথমোক্ত ঐ পর্যায়ের দুই জীবনধারাই দ্বিতীয়োক্ত দুটি পর্যায়ে অন্য এ পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আবার অনুসরণ করে এগিয়ে চলতে বাধ্য হয়।

এ মতবাদের সরল তাৎপর্য হল এই যে, শৈশবে যে-ধরনের জীবন ধারা বেয়ে মানবসত্তা বিকশিত হতে থাকে, কৈশোরেও সেই ধরনের জীবনধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। আবার, বাল্যকালের জীবন ধারার বৈশিষ্ট্যগুলোও পূর্ণবয়স্ক বিকাশ-পর্যায়ে পুনবৃত্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং বয়স এবং সময়ের পার্থক্য থাকলেও, বেশ লক্ষ্য করা যায় যে, কৈশোর এবং প্রথম শৈশবের বিকাশধারার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে। পাঁচ বছর বয়সের আগে

শিশুর সামনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এবং যেগুলোর সমাধানও সে করেছিল, সেগুলোই আবার উচ্চতর কৈশোর পর্যায়ে ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বারো থেকে আঠার বছর বয়সের মধ্যে অন্যরূপে তার সামনে উপস্থিত হতে থাকে।

শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক (ইমোশ্যনাল), এবং যৌন-অনুভূতিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দারুণ অসংহতি এবং বিশৃংখলা দেখা যায়। বাল্যকাল পর্যায়ে সেই অসংহতি এবং বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে আর তার ফলে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলতে থাকে।

কিন্তু এ কথা বড়রা সকলেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কৈশোর পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই বাল্য বয়সের সেই শৃঙ্খলা এবং সংহতি অকস্মাৎ যেন হারিয়ে যায়। আর তারই ফলে কিশোর-কিশোরীদের দেহে, মনে, আবেগ-প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিতে, এবং যৌন অনুভূতির ক্ষেত্রেও যেন এক বিরাট বিপর্যয় বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।

শৈশবে যেমন তাদের এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলোর সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানের জন্য চেষ্টা করতে হয়েছিল, তেমনি কৈশোরে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেও আবার সেইভাবে তার চারপাশের জগতের সঙ্গে নতুনভাবে মানিয়ে চলার তাগিদ এসে পড়ে।

ছোট্ট শিশুটি নিতান্ত অসহায়ভাবে যেমন তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে মানিয়ে চলতে না পারার জন্য অহরহ কত রকমের দুঃখ কষ্ট বেদনায় অনুভূতির সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক তেমনি কৈশোরে পা দিয়েও তাকে আবার কতগুলো সামঞ্জস্য বিধানের তাগিদ মেটানোর জন্য নিত্যনতুন টানাপোড়নের মধ্যে পড়তে হয় এবং তার জন্য তাকে প্রতি পদে নানা ভাবে ব্যর্থতা, লজ্জা এবং হতাশার দুঃসহ বেদনা সহ্য করতেও হয়। এ দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে কৈশোরের একটা বেশ বড় রকমের মিল আছে, এ কথা বড়রা নিশ্চয়ই মানবেন।

শিশুকে যেমন জীবন বিকাশের প্রথম পর্যায়ে তার শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছিল, কারণ মানুষের ভদ্রসমাজে মানিয়ে চলতে গেলে সেই সামাজিক দাবিগুলো তার স্বীকার না করে উপায় ছিল না – ঠিক তেমনই কৈশোরে দেখা দেয় তার আত্মসংযমের সমস্যা, যেটাকে শৈশবের শারীরিক সংযম-অভ্যাসেরই এক রকম পুনর্বৃত্তি বলা যেতে পারে।

তখন শিশুকে তার আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্নরাজ্য ত্যাগ করে, অসমসাহসিকতার সঙ্গে বাস্তব জগতের সামনে এসে দাঁড়াতেই হয়। কৈশোর পর্যায়ে এ ধরনের সমস্যার রূপ এবং পরিবেশ তার শৈশবের চেয়ে অনেকাংশে জটিলতর হয়েই থাকে।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময়ে ছেলে বা মেয়েদের দেহে অকস্মাৎ এমন কতগুলো পরিবর্তন এসে যায়, যেগুলো সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারই ফলে কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় এবং অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের অস্বস্তির ফলেই কৈশোর পর্যায়ে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের আচরণেই দেখা যায় এক সর্বব্যাপক সঙ্কোচ এবং আড়ষ্টতা।

এরই মধ্যে দিয়ে কৈশোর জীবনের বিকাশধারায় প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে জীবনের এক মহাসন্ধিস্থলে দেহ আর মনের অনির্বচনীয় নবোন্মেষের অভিজ্ঞতা নিয়ে সকলের সামনে নিজেকে অভিব্যক্ত করবার চেষ্টা করে চলে।

এ সবেরই প্রাথমিক লক্ষণগুলো দু'এক বছর আগে থেকেই ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায়। ছেলেমেয়েরা এ নব-মুকলোত কৈশোর পর্যায়ে মাথায় বেশ বড় হয়ে ওঠে, শৈশবের সেই গোলগাল ভাবটি আর তেমন থাকে না। শিশুসুলভ মিষ্টি গলার আওয়াজটিও কেমন যেন ভেঙে যায়। এ ছাড়া দেখা যায়, তাদের পড়াশুনার দিকে উৎসাহ খানিকটা কমে যাচ্ছে, আর ছেলেবেলার খেয়াল-খুশি সখ 'হবি' বদলে যাচ্ছে। এ কৈশোর পর্যায়ে উপনীত হয়ে ছেলেমেয়েরা কেমন যেন চিন্তাশীল এবং দুর্বোধ্য হয়েও ওঠে।

বলতে গেলে, প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী যেন এক নতুন বিভ্রান্তির মধ্যে এসে পড়েছে বলে ভাবতে শুরু করে। পনের-ষোল বছর বয়স হলেই নবকৈশোর-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা মনে করতে থাকে যে, তারা আর শিশুটি নেই, তারা খুব তাড়াতাড়ি বয়স্ক মানুষ হতে চলেছে। তখন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের খুঁটিনাটির দিকে অনেকটা বেশি পরিমাণে যত্ন-মনোযোগ আরোপ করতে দেখা যায়। তার আচার-আচরণ সম্পর্কে সমালোচনামূলক কোনও মন্তব্য হঠাৎ তার মন না বুঝে কেউ বলে ফেললে, সে খুব মনঃকষ্ট পায়, ক্ষুব্ধ হয়, রাগও করে।

এ গুরুত্বপূর্ণ কৈশোরের বিকাশধারায় ছেলেমেয়েদের মনের ক্ষমতাগুলো তাদের সহজাত বৃদ্ধি-প্রগতির পরিণামেই ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। এরই ফলে, কিশোর-কিশোরীদের মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক সামর্থ্যের দিক থেকে পরিণত মানুষেরই সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেখা যায়। তাদের নব-মুকুলিত কিশোর-সত্তা এ সব চমকপ্রদ সামর্থ্য সম্বন্ধে বেশ সচেতন হতেও থাকে এবং সেই সচেতনতার ভরসায় তারা সমাজের বা পরিবারবর্গের আরও পাঁচজনের মতো ছোট বড় নানা ধরনের সমস্যার মোকাবিলায় নিজেদের সামিল করতে চায়। তাই, তাদের মতামত ব্যক্ত করে এবং বুদ্ধিমতো সমাধান বাতলায়।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তরুণ-কিশোরদের এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সাযুজ্য বা সহযোগের স্বাভাবিক মনোবাঞ্ছায় বড়রা কেউ একটা তেমন আমল দেন না, বরং এ ধরনের কিশোরসুলভ স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে অকালপক্কতা মনে করে বিরক্তি বোধ করেই থাকে, অগ্রাহ্য করেন– অনেক ক্ষেত্রে, বকুনি ধমক দিয়ে কৈশোরের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশধারায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেই থাকেন।

বড়দের এ ধরনের হৃদয়হীন সহানুভূতিশূন্য আচরণ এবং মনোভাবের ফলে কৈশোর-উন্মেষিত ছেলেমেয়েরা খুবই ন্যায়সঙ্গত কারণে নিজেদের অবহেলোত বোধ করে এবং সমাজের সকলের ওপর, বড়দের ওপর, ছোটদের ওপর–বিশ্বের সকলের প্রতি তারা নিদারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পরিণামে জাগে বিদ্রোহী মনোভাব।

কৈশোরের বিকাশধারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল – আত্মনির্ভরশীলতার ভাব। এ কথা ঠিক যে, পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার উপযোগী দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্য তখনও জাগে না কিশোর-কিশোরীদের সত্তায়। তবু তাদের মধ্যে দেখা যায় স্বাধীনভাবে নতুন নতুন সৃষ্টিমূলক কাজ করার উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

তাদের সব কাজেই বড়দের, অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ আর তেমন তাদের কাছে পছন্দ হয় না। নিজের স্বাধীন পরিণতিশীল অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেক সময়ে তারা বড়দের সঙ্গে বেশ জোর দিয়েই তর্কবিতর্কের দুঃসাহসিকতা চর্চা করতে চায়। বড়দের কাছে সে আর যেন ছোট হয়ে থাকতে চায় না মোটেই। এর জন্যে বড়দের কাছ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শুধুই ধমক হজম করার দুর্ভাগ্য অর্জন করে।

বড়রা যদি তাদের কৈশোরের বিকাশধারা যথাযথভাবে স্মরণ করতে পারেন, তা হলে তাঁদের নিজেদের বিগত কৈশোরেও এমনি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির কৈশোর বিকাশের এ সঙ্ককটমুলক পর্যায়ে যথেষ্ট ধৈর্য এবং সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত অভিব্যক্তিগুলোকে মেনে নিতে সব সময় পারে না। তাঁদের বয়স্কজনোচিত উচ্চমন্যতা এবং আত্মমর্যাদাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর বয়সের সেই অবশ্যম্ভাবী মানসিক তথা সামাজিক পরিপক্কতার মর্যাদা দিতে যথেষ্ট কার্পণ্য বোধ করেই থাকে। কিশোর বয়সের বিকাশধারায় ছেলেমেয়েদের মনে ক্ষোভের অগ্নিগর্ভ পর্বত গড়ে ওঠে এ সব কারণেই।

অনেক সময় এ ক্ষোভের বিপরীত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হতাশা এবং বিষাদের দুঃসহ কলুষতাও পুঞ্জীভূত হতে থাকে নির্দোষ প্রাণবন্ত কিশোর-কিশোরীদের বুকের মাঝে। সে বড় করুণ পরিস্থিতি, কিশোর জীবনের নিদারুণ অব্যক্ত অভিজ্ঞতা-যার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছেলেমেয়েরা অহরহ জর্জরিত হতে থাকে।

তারা ভেবে আকুল হয়–তাদের নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে স্বাভাবিকভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেবে, নাকি, বড়দের আঙ্গুলোহেলনের অধীন হয়েই থাকবে, এবং এক-একটি কারবন কপির মতোই বড়দের হুবহু ব্যক্তিরূপ মেনে নেবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রা যা চান, তা হল এই যে, তাঁদের নিজেদের মতোই ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে হবে। তাই যখনই বড়রা লক্ষ্য করেন যে, কৈশোরে পা দিয়েই ছেলেমেয়েরা কেমন যেন অন্য সুরে কথা বলছে, অন্যভাবে চলতে চাইছে, তখনই তাঁরা অহেতুক আতঙ্কে বিচলোত হয়ে ওঠেন এবং মনে করেন– এবার বুঝি ছেলেমেয়েদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব হারাবার দিন এগিয়ে আসছে, বুঝি সমাজের নানা রকমের বিভ্রান্তির কবলে পড়তে চলেছে তাঁদের স্নেহের ছেলেমেয়েরা।

সেই ভয়ে তাঁরা তখন কিশোর-কিশোরীদের চারপাশে নানাভাবে অতি-সতর্কতার বাধানিষেধ দিয়ে অসহনীয় গন্ডি দিতে থাকেন, তাই তো কৈশোর বিকাশধারায় ছেলেমেয়েদের মনে জাগে বন্দীভাব। তার ফলে জন্মে বিরক্ত আর বিচ্ছিন্নতাবোধ।

এ সব তত্ত্ব-কথা নয়, বহুদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। কিশোর বয়সে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্যে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে ছেলেমেয়েদের এমনিভাবে খুব বেগ পেতে হয়। ফলে, তাদের মনে সব সময়েই একটা বিষম আলোড়ন চলতে থাকে। এ জন্যই বাড়ি, স্কুল, সমাজ সম্পর্কে মাঝে মাঝে তার মনে বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে এবং তারই ফলে অনেক সময় কাজকর্মে পড়াশুনায় ফাঁকি দেওয়া, বাড়ি থেকে পালানো, এমনি ধরনের নানান রকমের অবাঞ্ছিত ঘটনাও তাদের জীবনে ঘটতে থাকে।

কিশোর জীবনের বিকাশধারার অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হল– ভাব-প্রবণতা এবং ভাবাবেগের প্রকাশ। ছেলেমেয়েরা এ বয়সে নিজেদের নানা প্রকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্নে অহং ভাব এবং উচ্চাকাঙ্খার চর্চা করতে থাকে– সেটা তাদের বিকাশ প্রক্রিয়ার শুভ লক্ষণই বটে।

শারীরিক বিকাশ

কৈশোর বিকাশধারার পরিচয় ফুটে ওঠে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর মধ্যমে। এ বয়ঃসন্ধিকালে দেহের ওজন বাড়তে থাকে, সে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের হাত ও পায়ের তালুর গঠনও বাড়তে থাকে। তাদের শরীরের পেশী, হাড় এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রগুলোও পুষ্ট এবং পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি-প্রগতির লক্ষণগুলো নিয়ে ছেলেরা সাধারণের সামনে নিজেদের হাজির করতে দ্বিধা বোধ করে, কেমন যেন লাজুকতা এবং ভীরুবোধের অধীন হয়ে পড়ে।

কৈশোর পর্যায়ের শারীরিক বৃদ্ধি-প্রগতির ক্ষেত্রে যে সব আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক পরিবর্তনগুলো ছেলেদের মধ্যে দেখা দেয়, সেগুলোর মধ্যে থাকে স্বরভঙ্গ এবং ছেলেদের গলার স্বর কর্কশ কিংবা শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। তাদের দাড়ি গোঁফ জন্মায়। যৌন অংশেও লোম দেখা দেয়। বুক এবং কাঁধ বেশ সুগঠিত এবং চওড়া হয়ে উঠতে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিশোরদের দেহে পূর্ণবয়স্ক মানুষের শারীরিক লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এগুলো বড়রা সবাই লক্ষ্য করে থাকেন, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক, পরিবর্তনগুলোর সাথে ছেলেদের মানসিক যে সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তা অনুধাবনের সযত্ন প্রয়াস তাঁরা প্রায়ই করেন না।

মেয়েদের ক্ষেত্রে কৈশোর বিকাশধারার শারীরিক পরিবর্তনগুলো খানিকটা দ্রুতগতিতে প্রকাশমান হতে লক্ষ্য করা যায়। ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো যদি ফুটে ওঠে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে, তা হলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটি ঘটে ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে। সাধারণত দেখা যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে কৈশোর জীবনের শারীরিক পরিবর্তনগুলো তাদের ১২ বছর বয়সের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি করে প্রকটিত হয়ে ওঠে।

কৈশোর উন্মেষকালে মেয়েরা তাদের শারীরিক পরিবর্তনের যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখে দারুণভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে, সেটি হল তাদের স্তনগ্রন্থির দ্রুত বিকাশ। তাদের শরীরে এই নব-মুকুলিত গ্রন্থি দুটির আবির্ভাবে তারা যেমন দৈহিক অস্বস্তি খানিকটা বোধ করে, তেমনি মনের মধ্যেও লজ্জা, ভয় ভাব, আবেগ, আনন্দ, গর্ব প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির টানাপোড়েনে বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

এ দৈহিক পরিবর্তনটি তার পক্ষে ভাল না খারাপ, তা যদি কেউ সহানুভূতি সহকারে তাদের জানিয়ে না দেয়, তাহলে এ বয়সে তারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং বিরক্তিভাবাপন্ন হয়ে পড়তেও পারে।

এ ছাড়া, মেয়েরা কিশোরী হয়ে ও ঠোর সঙ্গে সঙ্গে দেহের উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে মেয়েদের যৌবনের চিহ্নগুলোও ক্রমশ ফুটে ওঠে। মেদ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয় এবং নিতম্ব কিছুটা ভারী হতে থাকে। যৌনাঙ্গের ওপরে লোমেরও উদ্ভব হয়।

এ সব শারীরিক লক্ষণগুলো থেকে মেয়েরা কিশোর-জীবনের হাতছানি বুঝতে পারে এবং বড় হয়ে ওঠার আনন্দভাবনায় প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে, তা বেশ দেখা যায়।

এ ধরনের শারীরিক পরিবর্তনগুলো কিশোর-কিশোরীদের সকলের ক্ষেত্রে এ সময়ে একই ভাবে দেখা না যেতেও পারে। কোনও কোনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবর্তনগুলো দেখা যায় কিছুটা আগে, আবার অনেক কিশোর-কিশোরী এ সব পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করে খানিকটা পরে। সাধারণত শীতের দেশগুলোতে কিশোর বিকাশধারার লক্ষণগুলো শরীরে প্রকাশিত হয় খানিকটা দেরিতে এবং ভারতের মতো গরম দেশে কৈশোরের শারীরিক পরিবর্তন এসে পড়ে তাড়াতাড়ি–এটা অনেকেই জানেন।

আগেই বলা হয়েছে–মেয়েদের মধ্যে সাধারণত এ সব কৈশোর বয়সোচিত শারীরিক পরিবর্তনগুলো ফুটে ওঠে ছেলেমেয়েদের চেয়ে কয়েক বছর আগেই। তারপর দেখা যায়, ১৪ বছর বয়স থেকে মেয়েদের বৃদ্ধি প্রগতি যেন কিছুটা কমতে থাকে আর ২০ বছর বয়স নাগাদ তাদের সেই বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে আসে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৫-১৬ বছর বয়সের ওপর থেকে তাদের কৈশোর বয়সোচিত বৃদ্ধি-প্রগতি কমতে থাকলেও, দেখা গেছে, তারা প্রায় ২২-২৩ বছর বয়স পর্যন্ত নানা রকম শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকে।

শারীরিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা

কৈশোর বিকাশধারার পর্যায়ে ছোটদের শরীরে যে সব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো খুবই স্বাভাবিক, এবং প্রকৃতির নিয়মেই সেগুলো হয়ে থাকে। বড়রা সেটা সহজভাবে গ্রহণ করলেও ছোটদের কাছে এ আকস্মিক পরিবর্তনগুলো খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে হয় না। এ সব শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে নিয়েই ছোটদের আচরণে এমন কতগুলো সমস্যা জেগে উঠতে দেখা যায়, যা থেকে অভিভাবকরা বেশ বিচলিত বোধ করেন।

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা যখন দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে, তখন বড়রা অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের 'ধাড়ি' বা মেয়েদের 'ধিঙ্গি' বলে আমাদের দেশে ঠাট্টা-তামাসা করে থাকেন কিংবা অনেক সময়ে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে ঐভাবে তাদের বড় হয়ে ওঠার কথাটা মনে করিয়ে দেন।

তাতে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে আর তার ফলে সহানুভূতির অভাবে প্রায়ই তাদের বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তেও দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এ সব কারণে তারা নিজেদের অকর্মণ্য, খাপছাড়া কিংবা অযোগ্য বলে ধিক্কার দিতে থাকে মনে মনে। এ রকম মনোভাব গড়ে উঠতে দেওয়ার জন্যে মূলত বড়রাই দায়ী।

কিশোর ছেলেদের গোঁফ জন্মানো, চোয়ালের হাড় চওড়া হওয়া, ব্রণ হওয়া, এ সব দেখে বড়রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহানুভূতিহীন তীক্ষ্ণ মন্তব্য এমনভাবে অসহায় কিশোরদের দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকেন, যাতে তারা মনমরা আর লজ্জিত হয়ে নিজেকে সঙ্কোচে সন্ত্রাসে গুটিয়ে রাখতে চায়, কারো সাথে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে বেশ দ্বিধা বোধ করে।

এ জন্যই কিশোর বয়সী ছেলেরা একটু একা থাকতে চায়, অল্প কিছুতেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে সব সময়ে সহ্য করতে নাও পারে। তাদের সম্বন্ধে সমালোচনা বা অন্য কারো সঙ্গে তুলনা করা হলে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করে।

তবে, এরকম বিষাদগ্রস্ত মনোভাব যে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই জেগে ওঠে, তা নয়। যে সব ছেলে সহানুভূতির পরিবেশে তাদের কৈশোরের দৈহিক পরিবর্তনগুলোকে সহজভাবে বড় হয়ে ওঠার গৌরবজনক লক্ষণ বলে আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়ে চলতে শেখে, তারা হয়ে ওঠে প্রফুল্ল প্রশান্তচিত্ত সবার প্রিয় কিশোর।

কৈশোর পর্যায়ে দ্রুত শারীরিক বিকাশ যেমন ছেলেমেয়েদের কাছে কিছুদিনের জন্য বেশ বিভ্রান্তিকর এবং কষ্টকর বলে মনে হয়, তেমনি এ শারীরিক বিকাশ যদি অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে বিলম্বিত হয়, তা হলেও ছোটরা লজ্জাবোধ করে হীনতাবোধে কষ্ট পেতে পারে।

এ সব ক্ষেত্রে, সহানুভূতিসহকারে প্রফুল্লতার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের শারীরিক বিকাশ যথাসময়ে যতটা হওয়া দরকার, ঠিক হবে – তা হলে তারা নিশ্চিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা, কাজকর্ম, খেলাধূলায় অংশ নিতে পারে।

কিশোর-কিশোরীরা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকার ফলে নিজেদের দেহ নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে চলতে-ফিরতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেই থাকে। অনেক সময়ে ক্লান্তি

ভরে তারা সামনে ঝুঁকে হাঁটা-বসা করার বদভ্যাস রপ্ত করে। দেখা গেছে, বহু ক্ষেত্রে হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে ওঠার ফলে, ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, সামনে ঝুঁকে চলাফেরা করে থাকে। এ জন্য তাদের বকুনি ধমক না দিয়ে যথেষ্ট বিশ্রামের সহৃদয় পরামর্শ দিতে হয় এবং সহজ সাধারণ যোগাসন ব্যায়ামাদির চর্চায় আকৃষ্ট করা উচিত।

তাদের এ কথাও বোঝাতে হয় যে, সুন্দর লম্বা চওড়া শরীর গড়ে উঠলে সেটা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আর সে জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে যে ধরনের বৃদ্ধি-প্রগতি দেখা দিচ্ছে, সে সবই প্রাকৃতিক নিয়মে সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

সামনে ঝুঁকে বসা-চলার অভ্যাস এভাবে দুর করতে না পারলে ছেলেমেয়েদের দৈহিক সৌষ্ঠব একেবারেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সেটা তাদের আজীবন হীনমন্যতার কারণ হয়ে থাকতে পারে।

মেয়েরা কৈশোর পর্যায়ে উদ্ভিন্ন শারীরিক বৃদ্ধি-প্রগতির ফলে যখন নিদারুণ লজ্জাশীলতায় বিব্রত বোধ করে, তখন মায়েরাই তাদের সঠিক ধরনের হালকা ঢিলে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দিয়ে, তাদের এ ধরনের অস্বস্তিকর মানসিকতার হাত থেকে যথাসাধ্য আরক্ষিত করার ব্যবস্থা করে থাকেন।

সেই সঙ্গে মা-বাবা বড়রা এটাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখলে ভাল করবেন যাতে অন্যান্য ভাইবোন বা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ কিশোরী মেয়ের শারীরিক উদ্ভিন্নতার প্রসঙ্গ নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা না করে। বরং এ সময় থেকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমীহ করে কথাবার্তা বলা এবং সব রকম আচরণ চর্চা করা উচিত ছোট-বড় সকলেরই। এ জন্য মা-বাবা নিশ্চয়ই যথাসম্ভব ছেলেমেয়েদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই সেই মতো পরামর্শও দেবেন।

কিশোর বয়সের ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই মুখে ব্রণ হতে পারে। এ বয়সে শরীরে মেদ সৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবত সে কারণে শরীরের ভিতর থেকে কিছু বেশি পরিমাণে স্নেহজাতীয় অর্থাৎ তৈলজাতীয় পদার্থ লোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে ধুলো-ময়লা মিশে মুখের ওপর কালো উঁচু ফুসকুড়ির মতো হয়। সাধারণত কিছু বীজাণু এ ফুসকুড়িতে আশ্রয় নিয়ে চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হয়– যার জন্য দেখা দেয় মুখব্রণ।

এ ব্রণের জন্য ছেলেমেয়েরা কিশোর বয়সে খুব উদ্বেগ বোধ করে, কারণ এ বয়সে তাদের নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন একটার পর একটা দেখা দেবার ফলে তারা বিচলিত হয়ে থাকে এবং সে কারণে মুখে ব্রণ হলেই তারা সেগুলো নষ্ট করে দিতে চায় আঙুলের সাহায্যে। এরই ফলে বীজাণুগুলো মুখের অন্য সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সে কারণেই ব্রণের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ব্রণ দুষিত হয়ে গেলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে মুখের ওপর দাগ হয়ে যেতেও পারে।

কিশোর-কিশোরীদের এ ধরনের মুখব্রণের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে হলে তাদের খোলা আলো-বাতাসে ব্যায়াম, খেলাধূলা, পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাওয়া-দাওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া দরকার। সাবান এবং গরম জলে নিয়মিতভাবে তাদের গা মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য স্বাভাবিক খাওয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যেমন– বেল, গুড়, শাক, ছোলা, মুগ ইত্যাদি নিয়মিত আহার্য তালিকায় রাখা দরকার।

এ বয়সে চকোলেট, লজেন্স্, আইসক্রিম, ভাজাভুজি, তেল-মসলা দেওয়া খাবার খুব কম দিতে হবে–এগুলো পেলে ছোটরা আপাত খুশি হয় ঠিক কথা, কিন্তু পরিণামে যকৃতের ব্যাধিতে, কোষ্ঠকাঠিন্যে, বায়ু বৃদ্ধিতে অভিভাবকদের এবং নিজেদেরও বিরক্তির কারণ সৃষ্টি করে তারা।

মানসিক বিকাশ

কিশোর বিকাশধারার প্রথম দিকে দেখা যায় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি কেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কিছু পরে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ খানিকটা হ্রাস পায়। এ সময়ে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ জাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্যের দিকে, তখন খবরের কাগজ থেকে রকমারি খবর সংগ্রহ করতে ভালবাসে, খেলাধূলা এবং ব্যায়াম-কসরতের জগতে বিভিন্ন কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করে। মোটের ওপর, এ বয়সে তাদের সাধারণ-জ্ঞান আহরণে বিশেষ আকুলতা অভিব্যক্ত হয়। চিন্তামূলক এবং যুক্তিতর্কভিত্তিক বিষয়বস্তুর দিকেও তাদের আগ্রহ বাড়তে দেখা যায়।

এ ছাড়াও, কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশের অন্যতম লক্ষণগুলো হল– তারা এ সময় তাদের জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নিজের মতো কাজ করতে চেষ্টা করে, নিজেদের বুদ্ধিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায় এবং বিচারবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সমস্যাদির প্রতিকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসে।

খেয়াল-খুশি বা 'হবি' চর্চার মধ্যে গান, বাজনা, নাটক, ছবি আঁকা, হাতের কাজ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা-এ সবের ওপরেও কিশোর-কিশোরীদের আগ্রহ-কৌতুহল বাড়তে থাকে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে।

কৈশোরের বিকাশধারাতেই ছেলেমেয়েরা তাদের জীবন সম্পর্কে কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলে। সমাজ সংসারে তাদের স্থান কোথায়, তাদের কাছে সেটিও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তাদের মনে ভাল-মন্দ, ন্যায়-নীতির ধারণাও ক্রমশ দানা বাঁধে। এ সব কারণেই প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীরা সংসারের অনেক জটিল কাজেও আগ্রহভরে অংশ নিতে চায় এবং সেই কাজগুলো বেশ মনযোগ সহকারে সুসম্পন্ন করতেও ভালবাসে।

এ বয়সে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করা এবং মুখস্ত করার ক্ষমতা আয়ত্ত হয়ে যায়। তার ফলে, বাল্যকালের বোকা ছেলেমেয়েরাও অনেক সময় কৈশোরের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাতেও বেশ কৃতিত্ব দেখাতে থাকে। তারা তখন পেতে চায় তাদের নব বিকশিত ক্ষমতা আর কৃতিত্বগুলোর প্রশংসা বাহবা অনুপ্রেরণা।

এ কৈশোরেই ছেলেমেয়েদের মনে জাগে আদর্শবোধের উন্মেষ। অন্যেরা কি বলে না বলে, তা নিয়ে তারা সচেতনতার পরিচয় দেয়। তারা তখন শিক্ষক, নেতা, মনীষীদের জীবনধারা এবং তাঁদের আদর্শে খানিকটা অভিভূত বোধ করে। সেভাবে তাদের জীবনাদর্শও গড়ে উঠতে থাকে। সে কারণে এ কৈশোর বিকাশধারাতেই ছেলেমেয়েদের সামনে আদর্শ মানুষদের জীবনকথা তুলে ধরা খুবই উপকারী।

কিশোর-কিশোরীদের বিবেকবোধের জাগরণও শুরু হয় এ সময়ে। এ বিবেকই তাদের অন্যায় কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে আর সেই বিবেক প্রতিপালিত হয় তাদের আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তির ওপরে। সে জন্যে এ বয়সে বকুনি, ধমক, তাড়ণা,

শাস্তির কোনও প্রয়োজনই হওয়ার কথা নয়–কৈশোরের সদ্যজাগ্রত মহান্ বিবেকের কাছে বড়রা সমীহ সহকারে যেভাবে যা উপস্থাপন করেন, সেগুলো তারা বিশেষ গুরুত্বসহকারে ভক্তিভরেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।

তবে বাল্যকাল অবধি যেগুলো বড়দের নির্দেশ বলেই ছোটরা বিনা দ্বিধায় মেনে চলেছে, লোকাচার বলে সহজ সরলভাবে যা অনুসরণ করে এসেছে, কৈশোরের উন্মেষযুগে তারা তখন সেগুলো সম্বন্ধে যুক্তিভিত্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করে–বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে সেগুলোর বিচার করে ভালভাবে আয়ত্ত করতে চায়।

এ সময়ে বড়দের উচিত – সহানুভূতি এবং ধৈর্যসহকারে ছোটদের কাছে সব কিছুর ব্যাখ্যা তুলে ধরা, আর যে সব কাজকর্ম আচার-আচরণের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না, সেগুলো সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের যুক্ত বিচারকে সমীহ শ্রদ্ধা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা এবং তাদের উপলব্ধির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাও উচিত।

সামাজিক বিকাশ

শৈশবের বিকাশধারায় ছোটদের সব রকম আগ্রহ, কৌতুহল ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে তাদের বাড়ির সকলকে আর আপনজনকে নিয়ে। আত্মকেন্দ্রিকতাই হলো এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। ছোটরা তখন তাদের খেলনা, বই, পুতুল, সব কিছুকেই নিজের বলে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ছোট ছোট দলে মেলামেশা করতে বা খেলাধূলা করতে তারা ভালবাসলেও, অধিকাংশ সময়ে তারা নিতান্তই আত্মতৃপ্তির জন্যই অন্যের সাথে খেলা-ধুলা করতে এগিয়ে যাবার আগ্রহ বোধ করে।

এর মূল কারণ হল এই যে, যে-ধরনের সহযোগীতা বোধ, আত্মত্যাগ, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে গেলে যে-ধরনের সমাজবোধ থাকা দরকার, সেই মানসিকতা শৈশবে যথাযথভাবে গড়ে ওঠে না। কোন্‌টি সামাজিক মাপকাঠিতে ভাল, আর কোন্‌টিইবা মন্দ, সেই ধারণা তার মনে জাগতে শুরু করলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ তেমন একটা করতে পারে না। কোথায় কেমন ধরনের ব্যবহার, আচরণ করতে হয়, তা রপ্ত করার জন্যে তাদের সঙ্গে বড়দের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। শিশুরা এ বয়সে তাদের নিজেদের দুর্বলতা, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটেই সচেতন হতে শেখে না।

কিন্তু যেমনই শৈশব এবং বাল্যকাল অতিক্রম করে ছোটরা তাদের কৈশোর বিকাশের ধারা অনুসরণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই তাদের ওপর পরিবেশের সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, কারণ এ বয়স থেকেই তারা নানা ধরনের সামাজিক বিধিব্যবস্থা এবং ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ পেতে থাকে। বড়দের স্নেহবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে তারা নিজেদের নব-অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে চায়।

এরই ফলে, কিশোর বিকাশধারার পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের তাদের ঘরবাড়ির সব ব্যাপারেই তেমন কৌতূহল বোধ করে না কিংবা বাড়ির বড়দের সর্বময় কর্তৃত্বকেই একমাত্র সত্য বলে আর ভাবে না। কারণ, তাদের জাগ্রত চেতনার সামনে বৃহত্তর সামাজিক জগতের অনেক কিছুই স্বরূপ মেলে ধরতে থাকে এ বয়সে। অভিভাবকদের সব কিছুই এখন আর তাদের কাছে তেমন অনুকরণযোগ্য বলে মনে হয় না। বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের অনেক নতুন বিষয় তখন তাদের সমাজ-চেতনায় আলোকপাত করতে থাকে।

এ সব কারণেই কিশোর-কিশোরীরা আত্মসচেতনতা থেকে সমাজসচেতনতার উদারতার মানসিকতায় ক্রমশই উন্নীত হতে থাকে। তাদের মন এ বয়সে নিজের দিক থেকে ধীরে ধীরে অন্যের দিকে ফিরতে থাকে, তাদের এ অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে মনোযোগ দিতে আগ্রহবোধ করে। দলবদ্ধ হয়ে কথা বলতে, কাজ করতে, খেলাধুলা করতে খুবই ভালবাসে এ বয়সে। দু'একজন প্রাণের বন্ধুকেও তাদের এ কিশোর জীবনে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। স্কুলে যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হলে, এ বয়ঃক্রমেই তা করা উচিত এ কারণেই।

তবে, কৈশোর বিকাশধারায় ছেলেমেয়েরা তাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবোধ যে একেবারেই উত্তরণ করে চলে আসে, তা নয়। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধিসম্মত আত্মকেন্দ্রিকতা থাকলেও, অন্যের প্রতি তাদের বিবেচনাবোধ, সহানুভূতি, নম্রতা, বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি বড়দের মতো জেগে উঠতে থাকে বেশ সুস্পষ্টভাবে।

এ বয়সে কিশোর-কিশোরীরা তাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে, এমন কি, বন্ধুকে খুশি করার জন্য নিজের প্রিয় বস্তুটিও দিয়ে দিতে পারে অকাতরে। এ সব আচরণই হল তাদের সমাজায়িত হয়ে ওঠার শুভ লক্ষণ। তাই এগুলোকে সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার-বিবেচনা করে তাদের পথনির্দেশ করতে হয়। এ বিরূপতা করলে তাদের সামাজিক বিকাশ অবশ্যই ক্ষুন্ন হয় এবং তাদের মনে বিষাদ বিরক্তি জাগে।

এই যে কৈশোর পর্যায়ে বন্ধুত্ব বিকাশের লক্ষণ, তা হল ছেলেমেয়েদের পরিণত জীবনের উপযোগী অভ্যাস, আচরণ এবং আদর্শবোধের অনুশীলন প্রক্রিয়ারই অভিব্যক্তি। এ অনুশীলনের মাধ্যমেই ছোট ছেলে-মেয়েরা কিশোর বয়সে তাদের সমাজ-জীবনকে সুস্থ পথে পরিচালিত করভার প্রয়াস পায়। এ বয়সে কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করার একান্ত প্রয়োজন, তা হল এই যে, সমাজ-জীবনে বন্ধুত্ব এবং সৎসঙ্গ লাভ করতে হলে অন্যের অধিকার এবং দাবিদাওয়ার মর্যাদা দিতে শেখা চাই। তা না শিখলে, সার্থকভাবে সমাজায়িত হওয়া যায় না এবং তার ফলে সকলের সঙ্গে মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেরা আকৃষ্ট হয় যথোচিত সামাজিক সৌহার্দ্য এবং সৌজন্যপূর্ন আচরণের মাধ্যমে-এ মূল্যবান সত্যটুকু সার্থকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উপযুক্ত পর্যায় হল– এ কৈশোর বিকাশধারা। ছেলেমেয়েদের নবজাগ্রত কৈশোর পর্যায়ে যাতে তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি যথাযথভাবে জাগরিত হতে পারে, সে বিষয়ে বড়দের উচিত তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করা।

পরবর্তীকালে সামাজিক মানুষ হিসেবে কিশোর-কিশোরীদের যা আয়ত্ত করা বিশেষভাবে দরকার, তা হল–

১. নিজেদের সামর্থ্য, অক্ষমতা, ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো বোঝবার ক্ষমতা,

২. নিজকে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এবং

৩. দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষকে সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা।

এরই ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গবদ্ধ জীবন গড়ে উঠতে থাকে। এ বয়সে তারা মনের মতো একটা আদর্শ খুঁজতে থাকে এবং সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে সমবেত হতে চায়, আদর্শের অনুগত হতে ভালবাসে। এ কারণেই কিশোর জীবনে ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট সঙ্ঘ-সমিতি গড়তে আগ্রহী হয়।

সঙ্ঘ-সমিতি গড়ে তোলার এ প্রবণতার মধ্যেই কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকাশলাভ করতে থাকে। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা যেন ধীরে ধীরে গৃহ-পরিবেশের সঙ্কীর্ণ সমাজ সত্তার প্রতি আগেকার মতো আর আকর্ষণ বোধ করে না।

অভিভাবকেরা তখন প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ন হন। কারণ অনেক ক্ষেত্রে কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা তাঁদের নির্দেশ-আদেশগুলো মেনে চলার ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে। তাদের সঙ্ঘ-সমিতির নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলতে থাকে, কিন্তু অভিভাবক-অভিভাবিকার নির্দেশাদির প্রতি গুরুত্ব যেন তাদের কাছে অনেকাংশে কমতেই থাকে।

এ ক্ষেত্রে, অভিভাবকদের বোঝা উচিত, যে কিশোর-কিশোরীদের বিকাশের পথে এ ধরনের বিচ্যুতি একান্তই স্বাভাবিক এবং সেটা সুস্থ লক্ষণ।

সুতরাং বড়রা যদি দেখতে চান যে, কৈশোর জীবনধারায় ছেলেমেয়েরা বৃহত্তর সমাজ জীবনে সার্থকভাবে নিজেদের ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ সাধনে এগিয়ে চলুক, তা হলে তাঁদের কথায় ছেলেমেয়েরা উঠতি বয়সে মঝে মাঝে অবজ্ঞা প্রকাশ করলেও, নিশ্চয়ই জানবেন, সেটা নিতান্ত সাময়িক বটে, এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে লক্ষ্য করবেন–তা থেকেই তাদের সমাজ-সচেতনতা জাগতে থাকে।

সহানুভূতি দিয়ে তাদের এ বিবর্তন-সংকটকে বড়দের মানিয়ে নিতেই হয়। ভ্রুকুঞ্চনে কোনও লাভ হয় না, এ কথা অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই নিঃসঙ্কোচে অবশ্যই স্বীকার করবেন।

কৈশোর বিকাশধারার প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা দেখতে চায় বাড়ির সকলের মধ্যে প্রীতি ও সখ্যভাব, আর চায় কাজকর্ম খেলাধুলায় সমবয়সীদের প্রশংসা আর অনুমোদন, মাঝে মাঝে বড়দেরও সাবাস বাহবা।

এগুলো না পেলে তারা নিজেদের অপদার্থ অবাঞ্ছিত মনে করে এবং বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তারা মনমরা হয়ে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে আর তার ফলেই তাদের আবদ্ধ মনের আনাচে-কানাচে জেগে উঠতে থাকে নানা রকম অশুভ ইঙ্গিত, নানা দুশ্চিন্তা–যেগুলো তার স্বাভাবিক জীবন বিকাশে বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলে।

তাই, বিশেষ সহনশীলতা, সদাজাগ্রত সহযোগিতা, আর সহৃদয় সহানুভূতি দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

বঃসন্ধিকালের গুরুত্ব

কৈশোরের যে দৈহিক-মানসিক বিকাশধারার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে থাকে, সেই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল এই যে, মানব-জীবনের সম্যক্ পরিণতি লাভের পথে তা ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণের পটভূমি রচনা করে থাকে।

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠতে থাকে, তখন তারা সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই এটি গ্রহণ করতে পারে। হাসিমুখে আনন্দের সঙ্গে তারা জীবনধারার এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে থাকে। দুঃখ-বেদনা, কান্না অভিমান যে তার মধ্যে একেবারেই থাকে না, তা নয়। কিন্তু সে সবই জীবনের নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এ্যাডভেঞ্চার আনন্দময় হয়েই ওঠে।

তবে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাছে জীবন ভারি দুঃসহ হয়ে উঠে। কৈশোর থেকে পরিণত বয়স্ক জীবনের পথে পদক্ষেপের এই বয়ঃসন্ধিকাল–প্রায় ১১ বছর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত। মেয়েদের জীবনে এই বয়ঃসন্ধিকাল আসে ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে এবং ছেলেদের জীবনে দেখা দেয় ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সে। আজকাল অবশ্য মেয়েদের অল্প বয়সে, এমন কি, ১০ বছর বয়সেও এ সন্ধিকালের লক্ষণ ফুটে ওঠে।

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠার পথে এমন একটি জায়গায় এসে উপনীত হয়, যখন প্রকৃতির নিয়মে তাদের শারীরিক বৃদ্ধির অগ্রগতি যেন অকস্মাৎ কিসের একদুরন্ত আহ্বানে অসামান্য কর্মচাঞ্চল্যে মেতে ওঠে। সেই আহ্বান হল বয়স্ক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের দুঃসাহসিক পর্যায়ে প্রবেশ করার আহ্বান। সেই দুঃসাহসিক জীবন পর্যায়ের উপযোগী দ্রুতব্যস্ত প্রস্তুতির 'সাজ-সাজ' রব যেন অনুরণিত হতে থাকে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের সময়ে তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ সময়ে তাদের উচ্চতা বাড়তে থাকে লক্ষ্যণীয়ভাবে, আর সেই সঙ্গে দেহের ওজনও বেড়ে চলে সমানুপাতিকভাবে।

স্বভাবতই বয়ঃসন্ধিকাল (পিউবার্টি) সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের দেহের মধ্যে এ ধরনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধিবিকাশের সৃষ্টি করতে থাকে বলে তারা নিজেদের দিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সচেতন হতে বাধ্য হয়। স্নেহময়ী প্রকৃতির দেবীর সযত্ন আগ্রহে কিশোর-কিশোরীরা তাদের শরীরে এ সময়ে যে সব পরিবর্তন আর বিকাশ লক্ষ্য করতে থাকে, তাতে তারা বিস্মিত হয়, নিত্য-নতুন আনন্দ-অভিজ্ঞতায় তারা শিহরিত হতে থাকে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের যাদুস্পর্শে। তাদের জীবনপাত্র উচ্ছলিত করে প্রকৃতি দেবী অপূর্ব মাধুরী দান করতে থাকেন নিত্য নব সাজে ।

শুধুমাত্র দেহের বাইরে লক্ষ্যণীয় উচ্চতা আর দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধিই নয়, দেহের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিগুলো (এনডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড্স্) একে একে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে এ বয়ঃসন্ধিকালেই। কারণ সেই গ্রন্থিগুলোর কাজ হল বিভিন্ন ধরনের রসক্ষরণের সাহায্যে শরীর ও মনের সব রকম বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপযোগী শক্তি সরবরাহ করা।

সেই অন্তঃক্ষরী দেহরসগুলো হল বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যার কম বেশি অনুপাত কিশোর-কিশোরীদের দেহ-মনের বৃদ্ধি-প্রগতি বিকাশের তারতম্য ফুটে উঠতে থাকে। সুতরাং বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে এ সব গ্রন্থিগুলোর সুষম বিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শারীর বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘকালের গবেষণা-নিরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিরসগুলো প্রকৃতপক্ষে এক-এক ধরনের হরমোন বা শক্তি-সঞ্জীবনী রসধারা, যা রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহের বিভিন্ন স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি-প্রগতি এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সে নিয়ন্ত্রণ কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে এমনই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের ভূমিকা গ্রহণ করে যে, ছেলেমেয়েরা অব্যক্ত এক অনুভূতিতে দিশাহারা বোধ করতে থাকে।

এ সব শক্তি-সঞ্জীবনী হরমোন রসধারার মধ্যে বর্তমান নিবন্ধ প্রসঙ্গে যেগুলো বিশেষভাবে আলোচ্য, সেগুলো হল–

১. ইনসুলিন, ২. থায়রক্সিন; ৩. অ্যাডরেনালিন, ৪. থায়রট্রফিন, ৫. অ্যাডরেনোকরটিনোট্রফিন, ৬. গোনাডোট্রফিন, ৭. থাইমিন, ৮. টেস্‌টোস্‌ টেরোন, ৯. ঈস্‌ট্রোজেন।

এছাড়া আরও যে সব হরমোন রসক্ষরণ বয়ঃসন্ধিকালে দেহে-মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, সেগুলো হল–মেলাটোনিন, গ্লোমেরুলোট্রাফিন, সোমাটোট্রফিন, প্রোল্যাকটিন, লিউটিনাইজন, ভাসোপ্রেসিন, অকসিটোসিন, প্যারথাইরিন, গ্যাসট্রিন, নোর‍্যাডরেন্যালিন, গ্লুকোকরটিকয়েড, প্রোজেসটেরোন, রিল্যাকসিন, প্রোসট্যাগ্ল্যানডিন্‌স্‌ ইত্যাদি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্যানক্রিয়াস অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটি থেকে ইনসুলিন নামে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রসধারা নির্গত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এ ইনসূলিন রসধারার তারতম্যের ফলে দেহের রক্তধারায় শর্করার পরিমাণের তারতম্য ঘটে, আর তা থেকে দেহের উষ্ণতার অস্থিরতাও সৃষ্টি হতে থাকে এবং তারই পরিণামে কিশোর বয়সের ব্যক্তিত্ববিকাশ এবং আচরণ-বৈশিষ্ট্যের নানাপ্রকার চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

তেমনি, গলার নিচে শ্বাসনালীর সামনে ছোট্ট থায়রয়েড অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাখনার মতো দেখতে এ গ্রন্থিটির দুটি অংশে চারটি প্যারথায়রয়েড গ্রন্থি থাকে। এ থেকে নির্গত হয় দেহের বৃদ্ধিবিকাশের সাহায্যকারী এক ধরনের থায়রক্সিন হরমোন বা শক্তি-সঞ্জীবনী রসধারা–যার সুদূর প্রসারী প্রভাব আছে অনুভূতি ও আচার-ব্যবহারের উপর। এর রসক্ষরণ কোনও কারণে ব্যাহত হলে শরীরের চামড়া শুকনো হতে থাকে, অবসাদ বিষণ্নতা জাগে, এমন কি গলগণ্ড জাতীয় ব্যাধিও সৃষ্টি হতে পারে।

শারীরবিজ্ঞানীরা কৃত্রিম থায়রকসিন রস ইন্‌জেকসন করে এ রসের অভাব দূর করতে চেষ্ট করেন। অনেক ক্ষেত্রে, থায়রয়েড রসধারার স্বল্পতার জন্যে দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে খর্বতা দেখা দেয়।

বয়ঃসন্ধিকালে গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিরস সৃষ্টির জন্য দায়ী অন্য একটি গ্রন্থি হল কিডনীর কাছে অ্যাডরেনাল বা প্রক্ষোভ গ্রন্থি। ক্যানন নামে এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের আবেগ-প্রক্ষোভের অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির সূত্র

অনুসন্ধান করার সময়ে দীর্ঘকাল গভীরভাবে গবেষণা-নিরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কিশোর বয়সের বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা যদি তীব্র আবেগ -প্রক্ষোভের পরিবেশের মাঝে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তা হলে প্রথমেই তাদের এ অ্যাডরেনাল প্রক্ষোভ গ্রন্থিটি অত্যন্ত বেশি রকমের সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন এর কাজ হল অ্যাডরেনালিন রসক্ষরণের মাধ্যমে যকৃৎ থেকে শর্করা নিষ্কাশন করে রক্তে মিশিয়ে দেওয়া।

অ্যাডরেনাল অন্তঃক্ষরী গ্রন্থির উত্তেজিত অবস্থায় অত্যধিক শর্করা নিঃসৃত হলে যেমন অবসাদ প্রতিরোধ করার শক্তি সৃষ্টি হয়, তেমনই শারীরিক পেশীগুলোর বৃদ্ধি-প্রগতি দ্রুততা লাভ করে। এ অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের অত্যাধিক কর্মোন্মাদনার জন্যও দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে। এ রসক্ষরণের ফলেই যৌনাঙ্গে লোম সৃষ্টি হয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরী গ্রন্থি হল পিটুইটারি। অতি ক্ষুদ্র এ গ্রন্থিটির অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বৃদ্ধি-প্রগতির খবরদারী করা, তাই এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে থাকে সমগ্র দেহ-মনে। এটি তাকে মস্তিষ্কের ঠিক নিচেই এবং মস্তিষ্কের সামনের অংশটির ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অন্যান্য সমস্ত অন্তঃক্ষরী গ্রন্থির রসক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে এই খবরদারী গ্রন্থিটিরই উত্তেজনার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুপাতে।

এ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের দেহের মধ্যে থায়রট্রফিন হরমোন রসক্ষরণ হয় বলেই থায়ররেড গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আবার পুষ্টিকারক হরমোনের সাহায্যে এ গ্রন্থি থেকেই কিশোর-কিশোরীদের দেহপুষ্টি অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করা হয়।

এ ছাড়া, অ্যাডরেনোকরটিনোট্রফিন হরমোন রসক্ষরণও এ গ্রন্থিটি থেকে হয়, যার ফলে অ্যাডরেনালগ্রন্থি থাকে সুনিয়মী। এমন কি, এ পিটুইটারী খবরদারী গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রফিন হরমোন নামে আরও এক ধরনের রসক্ষরণের সাহায্যে ছেলেদের লিঙ্গ, শুক্রাশয় এবং মেয়েদের ডিম্বকোষ জরায়ুর বৃদ্ধি-বিকাশ নিয়ন্ত্রণের কাজও চলতে থাকে। সুতরাং ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে যৌন গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তোলার কাজে পিটুইটারী গ্রন্থির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গলার নিচে যে থাইমাস অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিটি আছে, সেটিও অন্যান্য গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণে অসামান্য সহযোগিতা করে থাকে। কোনও গ্রন্থি উত্তেজিত হয়ে উঠে মাত্রাতিরিক্ত রসক্ষরণ শুরু করতে বাধ্য হলে, দেহ মনের ওপর তার কোনও রকম ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করার জন্য তখন থাইমাস গ্রন্থির থাইমিন রসক্ষরণের ব্যস্ততা উপলব্ধি করা যায়।

এমনি যে সব নানা প্রকার অন্তক্ষরী গ্রন্থি কিশোর জীবনের বয়ঃসন্ধিকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে আমাদের বর্তমান নিবন্ধে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রধান হল গোনাড বা যৌন অন্তঃক্ষরী গ্রন্থি। ছেলেমেয়েরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে যত রকমের বিচিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দেয় এ গোনাড গ্রন্থি।

পিটুইটারি গ্রন্থির নির্দেশে যৌন গ্রন্থিগুলো সজাগ হয়ে উঠে যৌন বিকাশমূলক হরমোন রসক্ষরণ শুরু করে বলে কিশোর জীবনে যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

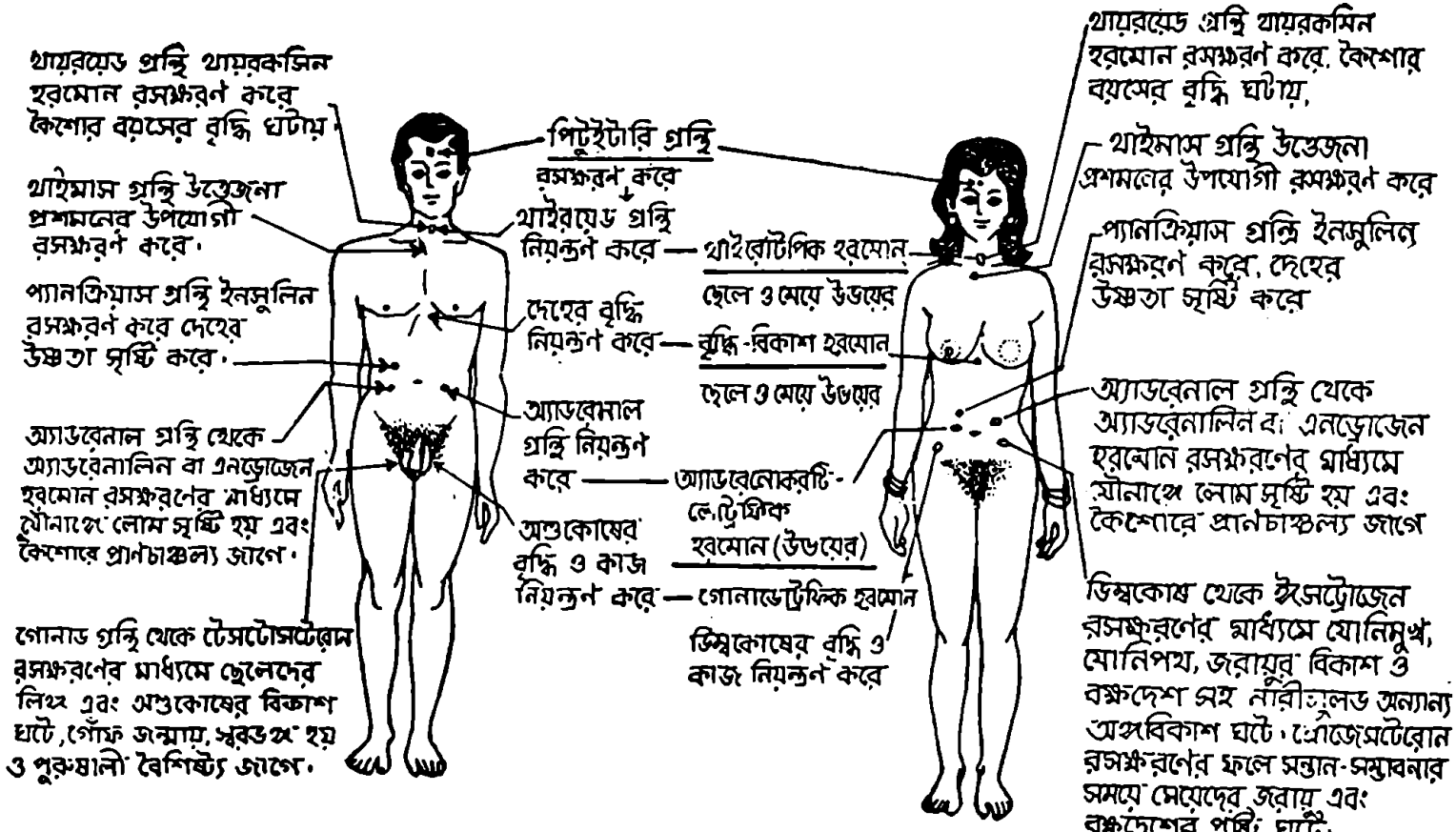

চিত্র১— অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিগুলির কাজ

গোনাড বা যৌন গ্রন্থি ব্যবস্থার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালের সময়োপযোগী টেসটোসটেরোন হরমোন রসক্ষরণের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে শুরু হলে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ার ফলে কৈশোর বিকাশধারায় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দৈহিক এবং মানসিক বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এ বয়সে কিশোর কিশোরীরা তাদের যৌন অঙ্গের বিশেষ পুষ্টি এবং সৌষ্ঠব লক্ষ্য করে বিস্ময়াবিষ্ট হতে থাকে, কিছুটা লজ্জা-সংকোচেও তারা বিচলিত বোধ করে। যৌনাঙ্গের ওপরে এবং বাহুমূলেও মৃদু লোম সৃষ্টি হতে দেখে তারা বেশ বুঝতে পারে যে, তারা আর ছোট নেই, ক্রমে বড় হতে চলেছে। প্রকৃতির ইঙ্গিতে বড় হওয়ার এ উপলব্ধি তাদের মনে লজ্জা সঙ্কোচের সাথে আত্মমর্যাদা বোধও জাগাতে থাকে।

এ মিশ্র অনুভূতি উপলব্ধির টানাপোড়েনে কিশোর-কিশোরী মাত্রই বয়ঃসন্ধিকালে কিছু না কিছু চিন্তাগ্রস্ত হয়েও পড়ে। সেটা নিশ্চয়ই অভিভাবকদের নজরে আসে। তখন তাঁদের নিজেদের কৈশোর জীবনের মানসিকতা স্মরণে রেখে ছোটদের কাছে যথাসম্ভব সহানুভূতিসম্পন্ন, বন্ধুভাবাপন্ন হবার চেষ্টা করতেই হয়।

বিশেষ করে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে যখন তাদের স্তনগ্রন্থিগুলোও সৌষ্ঠব অর্জনের লক্ষণ প্রকাশ করতে থাকে যৌনগ্রন্থির পুষ্টিবিকাশের সাথে, তখন মেয়েরা স্বভাবতই নিদারুণভাবে অন্তরে-বাইরে বিচলিত হয়ে পড়ে। বড়দের সহানুভূতি এবং সমীহবোধ তাদের জীবনে তখন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে তাদের স্তনদেশের আঙ্গিক সৌষ্ঠব বিকাশের জন্যেই শুধু নয়, স্তনদেশের এক অভূতপূর্ব স্পর্শকাতর পুলক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের যৌনাঙ্গের ভিতরে ও বাইরে নতুন এক ধরনের অনির্বচনীয় শিহরণের উপলব্ধিও তাদের শারীরিক বিকাশের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। তারা বুঝতে পারে, স্তন দেশের বিকাশ পুষ্টি এবং যৌনাঙ্গের বিকাশ-বৃদ্ধির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রকম স্নায়ুতান্ত্রিক সংযোগ সুত্র আছে।

এ উপলব্ধি তাদের কাছে এক রকম আত্মজ্ঞানের উপলব্ধির মতোই অপরিমেয় গুরুত্ব বহন করে আনে এবং তারা এ রহস্য নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সদা চিন্তামগ্ন হয়েও পড়ে। অর্থাৎ তারা আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে এ সচেতনতা লাভ করে যে, নব-মুকুলিত স্তনবিকাশও তাদের যৌন বিকাশের একটি গুণবৈশিষ্ট্য মাত্র।

মেয়েদের লজ্জাশীলতা এবং স্পর্শকাতরতা যে ছেলেদের চেয়েও এ বয়সে খুব বেশি হতে দেখা যায়। তার মূলগত কারণ অনেকাংশেই হল এ বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারজনিত উপলব্ধি।

ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যৌনাঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গের দীর্ঘতা বৃদ্ধি, পুষ্টতা এবং কোনও কোনও সময়ে তার স্ফীতজনিত এক ধরনের উত্তেজনা তাদের মনে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বলেই জানা গেছে। লিঙ্গস্ফীতজনিত উত্তেজনা কিংবা উত্তেজনাজনিত লিঙ্গস্ফীত থেকে ছেলেরা যে খানিকটা পুলক অনুভূতির আস্বাদন লাভ করে, সেটা তাদের কাছে স্বভাবতই আকাঙ্খিত হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুলকানুভূতির পরিণামে সর্বাঙ্গে যে অবসাদ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে, তা থেকে জাগে বিষাদবোধ, অপরাধবোধ ও নিদারুণ লজ্জা-সঙ্কোচ।

এ লিঙ্গের মধ্যেকার মূত্রনালী দিয়েই দেহের আবর্জনা রূপে মূত্র নিষ্কাশন হয়ে থাকে। এ মূত্রনালী দিয়েই আবার দেহের বীর্যরস বাহিত হয়ে শুক্রাণুগুলো নির্গত হয়। লিঙ্গের নিচে অন্ডকোষ নামক যে নরম থলিটির মধ্যে শুক্রাশয় দুটি অবস্থান করে, তারও ওজন এবং আয়তন ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালে বৃদ্ধি পায়।

ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালে শুক্রাশয়ের কাজ হয় দু'ধরনের–এরই মধ্যে পুরুষ মানুষের শুক্রাণু এবং প্রাণ সৃষ্টির বিস্ময়কর জীবকোষ সৃষ্টি হতে থাকে, আবার এখান থেকেই টেসটোসটেরোন নামে পুরুষালী যৌন রসক্ষরণও শুরু হয়ে যায়–যার প্রভাবে ছেলেদের উচ্চতা. ওজন বাড়তে থাকে, কাঁধ চোয়াল চওড়া হতে থাকে এবং বাহুমূলে যৌনাঙ্গে হাতে পায়ে লোম আর মুখে গোঁফ দাঁড়ি হতে থাকে।

শুক্রাণুর সৃষ্টি কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে শুরু হয়ে সাধারণত বার্ধক্য পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্তান সৃষ্টির রহস্যকান্ডে পুরুষের যে ভূমিকা তাহল এই শুক্রাণু–যা নারীর জরায়ু মধ্যে একটি ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হবার জন্যে পাঠিয়ে দিতে হয়। যখনই নারীদেহের মধ্যে একটি ডিম্বকোষের সঙ্গে পুরুষের একটি শুক্রাণু ছেলেদের মুত্রনালীর মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে আসে চরম যৌন পুলক উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে।

যখন ছেলেদের লিঙ্গ মধ্যেকার অসংখ্য সংবেদনশীল স্নায়ু যৌন অনুভূতির তীব্র উত্তেজনায় সাড়া দিতে গিয়ে তীব্রবেগে প্রচুর রক্ত সঞ্চালনের কাজ শুরু করে দেয়, তখন লিঙ্গটি দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে খানিকটা দৃঢ়বদ্ধ স্ফীতকায় আকার ধারণ করে। একেই বলে লিস্ফস্ফীতি এবং এ ধরনের দৃঢ়স্ফীত পুরুষ লিঙ্গই নারী-যোনিতে প্রবেশ করে শুক্রাণু নিক্ষেপ করার উপযোগী ক্ষমতা অর্জন করে।

চরম যৌন পূলক অনুভূতির সময়ে যৌনাঙ্গের পিছনে প্রস্‌টেট গ্রন্থিটি সঙ্কুচিত হয় এবং তার ফলে খানিকটা বীর্যরস বাহিত শুক্রাণু মূত্রনালী মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত এবং ঘনঘন ঝাঁকুনির মতো অঙ্গ-প্রক্ষেপের মাধ্যমে এ সঙ্কোচন ঘটতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে চরম যৌন পুলক অনুভূতি খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। চরম পুলকের পরেই যৌন উত্তেজনার তীব্রতা হ্রাস পায় এবং এক ধরনের অবসাদী বিশ্রামের উপলব্ধি জাগে, তার ফলে পুরুষ লিঙ্গটি আবার সহজ স্বাভাবিক কোমল আকৃতি ফিরে পায়।

বয়স্ক পুরুষ-সত্তার এ দেহগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ফলে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের সময়টা তাদের কাছে এক অতুলনীয় তাৎপর্য বহন করে আনে। এ বয়সে ছেলেরা নিজেদের সম্পর্কে সব কিছুতেই দারুণ গর্ব অনুভব করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনুভূতি-উপলব্ধি অতি সংবেদনশীল হয়েও ওঠে।

কিন্তু পরিণত জীবন পর্যায়ে পৌছনোর পথে এ ধরনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা কিছুটা প্রচ্ছন্ন আতংক বোধ করেও থাকে, নিজেকে নিঃসঙ্গ অসহায় বলে মনে করে।

মনের মধ্যে তখন সব নব আশা-আকাঙ্খার উন্মেষ ঘটতে থাকে, আর সেগুলোর ফলে জীবনে অনেক তোলপাড় জাগে, নিজের উৎকর্ষমান এবং বিকাশের পর্যায় সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে মনের মধ্যে। ভয় হতে থাকে যৌনাঙ্গ সম্পর্কে যে সব কথা ইতিপূর্বে শোনা আছে, সেগুলোর সত্যতা নিয়ে।

তাই সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে চায়–বিশেষ করে, যৌনাঙ্গ নিয়ে কৌতুহল বশত নাড়াচাড়া করার সময়ে যে লিঙ্গস্ফীতি ঘটে, পুলক অনুভূতি জাগে এবং চরম পুলকের সাথে বীর্য পাত হয়ে যায়, সেই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার বিস্ময়ে তাদের মনে হস্ত মৈথুন বা স্বমেহনের আকাঙ্খা সম্পর্কে নানা রকম দুশ্চিন্তা জাগতেও থাকে।

আর এ সাথেই নবলব্ধ পুরুষ-সত্তার বিপুল সম্ভাবনা এবং অনাগত ভবিষ্যতের দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভাবনাতেও কিশোর-মন হয়ে ওঠে উদ্বিগ্ন।

এমনই বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর মাত্রেই তার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে এবং সে নিঃসন্দিহান হতে চায়, আশ্বাস পেতে চায় যে, তার জীবন-বিকাশ 'স্বাভাবিক' ভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং অন্য সমস্ত ছেলেদের মতোই তা সুস্থ সহজ জীবনধারা বহন করে আনছে, সে অন্যদের মতোই যথাযথভাবে একজন 'পুরুষ' মানুষ হয়ে উঠছে।

এ বয়সে অভিভাবকরা যে জিনিসটা অবশ্যই করবেন, তাহল–তাঁদের ছেলে যে সব সন্দেহ ভীতি উদ্বেগ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে বলে মনে হবে, সেগুলো সম্পর্কে অন্তরঙ্গ সহৃদয় আলোচনা পরামর্শ করার পরিবেশ রচনা করতে পারেন–যাতে মা বাবার কাছে বন্ধুর মতোই ছেলে তার অস্বস্তি-উদ্বেগের কথা মন খুলে বলতে পারে এবং পরামর্শ চাইতে এগিয়ে আসে। এমনি ভাবেই সে তার দেহ মনের পরিবর্তনগুলোর তাৎপর্য সাহসিকতার সঙ্গে মেনে নিয়ে পরবর্তী আসন্ন সব রকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হবার জন্য সাগ্রহে উৎসুক হয়ে থাকবে–অহেতুক ভিত্তিহীন আতঙ্কে সদা-বিরক্ত অতি-সংবেদী হয়ে আর থাকবে না।

এ ব্যাপারে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের মানসিকতায় যা নিদারুণ এক প্রক্ষোভ-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে থাকে, তাহল–যৌন লিঙ্গস্ফীতজনিত চরম পুলক অনুভূতি ঘটলে লিঙ্গ থেকে যে বীর্যরস ক্ষরণ হয়, তার প্রথম অভিজ্ঞতা।

এ প্রথম বীর্যস্খলনের জন্য কিশোর বয়সী কোনও ছেলে নিজে সক্রিয় না হতেও পারে–শুধুমাত্র অন্তঃক্ষরী যৌন (গোনাড) গ্রন্থির স্বাভাবিক পুষ্টি বিকাশের ফলেই ঘুমের মধ্যে অজানিতভাবে কখনো লিঙ্গস্ফীতি ঘটে এবং ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রথম বীর্যস্খলন হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতি বহু কিশোরের জীবনে সৃষ্টি হয় এবং তখন স্বাভাবিক কারণেই ছেলেরা বিষম চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা যে তাদের কৈশোর জীবনের বিকাশধারার স্বাভাবিক সুস্থতারই লক্ষণ, এ কথা কেউ কখনও তাদের বুঝিয়ে বলেন না। সে জন্যই তারা এ নিয়ে সদাসর্বদা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করতে করতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে, কারও সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা পরামর্শ করতেও পারে না। ফলে, ক্রমশ অনেক কিশোর অপরাধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে এভাবে এক অশুভ গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন সৃষ্টি হতে থাকে।

আর, মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য প্রকৃতির নিয়মে বীর্যস্খলনের পরিস্থিতি ঘটলেও, তাদেরও যৌন পুলক অনুভূতির পরিণামে যৌনাঙ্গে যোনিমধ্যে এক ধরনের স্বচ্ছ পিচ্ছিল রস-সঞ্চার হয়ে থাকে। পরিণত কৈশোর জীবনবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও স্তনদেশ, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌন স্পর্শকাতরতা জাগতে থাকে এবং বিভিন্ন পরিবেশে সেগুলোর মাধ্যমে যৌন পুলক অনুভূতি সৃষ্টি হলে যোনি মধ্যে ঐ ধরনের রস-সঞ্চারের সম্ভাবনা ঘটে এবং রসধারার প্রবাহে মৃদু শিহরণজনিত পুলক অনুভূতি বৃদ্ধি পায়।

কিশোরী মেয়েরা তেমনি পরিস্থিতিতে বিলক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মনে করে, নিশ্চয়ই কোনও অবাঞ্ছিত কারণে তাদের দেহের শক্তিক্ষয় হতে চলেছে এভাবে। সেটা যে ছেলেদের মতো বীর্যক্ষরণ নয়, মেয়েদের যৌন জীবনের শুভ সঙ্কেত এবং সহজ স্বাভাবিক প্রস্তুতিমাত্র, সে কথা ভালভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা আগে থেকে বড়রা মা-মাসীরা কেউই করেন না।

আর যে সব নতুন পরিবর্তন মেয়েদের দেহে বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দেয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–দেহের বিভিন্ন জায়গায় লোমের সৃষ্টি হয়, ওজন বৃদ্ধি পায় এবং বক্ষদেশ আর নিতম্ব অংশে নারীর সুলভ বঙ্কিম রেখায়িত সুপুষ্টি জেগে উঠতে থাকে।

তবে, কিশোরী মেয়েদের জীবন বিকাশের এ বয়ঃসন্ধিকাল পর্যায়ে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঞ্চল্যকর বিবর্তন এনে দেয়, সেটি হল তাদের মাসিক ঋতুস্রাব। এ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব সহজ সরলভাবে আগে থেকেই মেয়েদের বুঝিয়ে না রাখলে তারা যে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়ে, সেই অস্বস্তির অভিজ্ঞতা অভিভাবক মাত্রেরই হয়ে থাকে।

ঋতুস্রাব বলতে বোঝায় কিশোরী মেয়ে সন্তান ধারণের শুভশক্তি অর্জন করেছে, মাতৃত্বের পুণ্যধর্ম পালনে সে হয়েছে প্রস্তুত। অভিভাবক অভিভাবিকারা নিশ্চয়ই এ কথা ভালভাবেই জানেন যে, মেয়েদের কৈশোর জীবন বিকাশের বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায়ে তাদের দেহের মধ্যে ডিম্বকোষ থেকে প্রকৃতির রহস্যময় জৈব-ঘটিকার সঠিক সময়সূচি অনুসরণ করে প্রতি ২৮ দিন অন্তর একটি করে ডিম্বানু নেমে আসে তাদের জরায়ু গর্ভে–কোনও পুরুষের শুক্রাণু শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে সন্তান সৃষ্টির আশায়।

শুক্রাণু দ্বারা সমৃদ্ধ না হলে মেয়েদের জরায়ু থেকে সেই ডিম্বানু আপন রক্তধারায় স্নাত হয়ে অতিস্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ প্রকৃতিবন্ধ নিয়মে এবং প্রক্রিয়ায় রক্তস্রোতের সঙ্গে যোনিপথ দিয়ে বর্জিত হয়ে যায়।

এটা নিশ্চয়ই কোনও অস্বাভাবিক ব্যাধি নয়। তবু মা-চাচি বা বড় বোনদের নিতান্তই অজ্ঞতা এবং অহেতুক লজ্জা-সঙ্কোচের বশে এ গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি কিশোরী মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের জীবন বিকাশকে শঙ্কাহীন করে রাখার শুভ প্রচেষ্টা বড় একটা করেন না বলে মেয়েরা অকারণ নিদারুণ ভয়-আতঙ্কে তাদের স্বাচ্ছন্দ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বসে।

আসলে, কিশোরী মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে দেহের মধ্যে যে সব পরিবর্তন জাগে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায় তাদের ডিম্বকোষে পরিণতির মধ্যে। এ ডিম্বকোষে তখন যে বিশেষ ধরনের ইসট্রোজেন হরমোন রস-সঞ্চার শুরু হয় পিটুইটারি অন্তঃক্ষরী গ্রন্থির প্রভাবে, তার প্রতিক্রিয়া কিশোরী মেয়ের দেহে-মনে হয় ব্যাপকভাবে।

ছেলেদের যৌনাঙ্গের শুক্রাশয়ের মতো, মেয়েদের ডিম্বকোষগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কর্তব্যকর্ম পালন করতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, এ ডিম্বকোষ থেকেই প্রতি চার সপ্তাহ অন্তর পরিপক্ক ডিম্বানু নেমে আসে যা সন্তান সৃষ্টির সম্ভাবনা বহন করে আনে, আর এ ব্যবস্থার ফলেই নারীদেহের সন্তান-সম্ভাবনার আভ্যন্তরীন প্রত্যঙ্গ প্রক্রিয়াগুলোকে যথাযথভাবে সক্রিয় করে রাখাও হয়।

ডিম্বকোষগুলো হল বাদামের মতো আকৃতির দুটি আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ–মেয়েদের পাছা এবং কোমরের বেষ্টনীর মধ্যে গভীর গহনে যার অবস্থান অতি প্রচ্ছন্নভাবে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, ঐ দুটি প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ ডিম্বকোষ দুটি অতি বিস্ময়কর ভাবে যে কোনও কন্যা শিশুর জন্মের আগেই তার দেহ-ভ্রূণে জননীর জঠরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তখন থেকেই ঐ ডিম্বকোষ অপরিণত কিছু ডিম্বানু ধারণ করেও থাকে।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে ঐ ডিম্বানুগুলো পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে ধীরে ধীরে প্রতি মাসেই, এবং সেই পরিণতিকাল একাদিক্রমে অব্যাহত থাকে নারীদেহে ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত। এক অতি বিস্ময়কর রহস্যঘন এ ডিম্বানু সৃষ্টির প্রক্রিয়া, যার কার্যকারণ সম্বন্ধে মেয়েরা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে কত কিছুই না কল্পনা করতে শুরু করে দেয়।

খুব সহজ সরলভাবে বলতে গেলে, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের সন্তান জনন প্রক্রিয়ার মূল কাজ হল একটি করে পরিণত পরিপক্ক ডিম্বানুকে ঠিকমতো তৈরি করে এগিয়ে দেওয়া কোনও একটি পুরুষ-শুক্রাণু কোষের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে।

একবার যদি এ মিলন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়ে যায়–যাকে বলা হয় নিষেক বা সন্তান সম্ভাবনা কিংবা ভ্রূণসৃষ্টি–তখন কিশোরী মেয়ের দেহের অভ্যন্তরে সেই সমৃদ্ধ প্রাণসঞ্জীবিত ডিম্বানুটির ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায় থেকে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ওঠার এবং সযত্নে লালিতপুষ্ট হওয়ার সব রকম ব্যবস্থাই চলতে থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত।

প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে যে, ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বানুটি নিঃসৃত হওয়ার সময় থেকেই মেয়েদের সন্তান-সম্ভাবনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে ডিম্বানুটিকে সযত্নে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পুরুষ-শুক্রাণুর সাথে মিলিত করে দেওয়ার কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য সেটিকে যথাস্থানে উপনীত করার প্রয়োজন আছে। ডিম্বনালী অর্থাৎ ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে সুচারুভাবে সাধিত হয় সেই উদ্দেশ্যে।

ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে দু-পাশে দুটি; প্রত্যেকটি ডিম্বকোষ থেকে একটি করে টিউব বেরিয়েছে। যখন ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বানু নির্গত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তখন এই ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে সেটি সঞ্চালিত হয় এবং টিউবের মুখভাগে সরু সরু আঙুলের মতো যে কয়েকটি ক্ষদ্রাকৃতি শুঁড় থাকে, সেগুলোর দ্বারা এক ধরনের বায়ু শোষণ পদ্ধতির সাহায্যেই ঐ সঞ্চালন প্রক্রিয়া সহজে সাধিত হতে থাকে।

একবার এ শোষণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অধীনে এসে গেলেই ঐ ডিম্বানুগুটির এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকে। ঐভাবে ডিম্বানুর অগ্রগতির পথে অবিরাম ভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে থাকে ফ্যালাপিয়ান নালী গাত্রের নরম পেশীতন্ত্রগুলোর স্বয়ংক্রিয় সঙ্কোচন প্রবাহের তরঙ্গ এবং সেখানকার 'সিলিয়া' নামে সূক্ষ্ম' লোমাসদৃশ এক অবিচ্ছিন্ন পরিবহন গালিচার সহযোগিতা।

ঠিক এই ফ্যালোপিয়ান নালী পথেই ভ্রূণ সৃষ্টির চরম মিলন মুহূর্তটি সংঘটিত হয়ে থাকে। মেয়েদের যোনিপথের অভ্যন্তরে যৌন-সংযোগের মাধ্যমে পুরুষ-শুক্রাণু নিক্ষিপ্ত হবার পরে বেশ কয়েকটি শুক্রাণু সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় ফ্যালোপিয়ান নালীর মধ্যে। অবশ্য একটিমাত্র শুক্রাণুই ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি শুরু করে দেয়। তাকে বলা হয় নিষিক্ত হওয়া।

ভ্রূণায়ন হয়ে যাবার পর শুক্রসঞ্জীবিত ডিম্বানুটি নবপর্যায়ে যাত্রা অব্যাহত রাখে ফ্যালোপিয়ান নালীপথ মাধ্যমে। তার গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে, পেশীতন্তু দিয়ে তৈরি, আপেল-ন্যাসপতির আকারে গঠিত জরায়ুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। এখানেই ডিম্বানু বাসা বাঁধে পুরো নটি মাস তার পরিণত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য, আর এ সময়টাতেই মেয়েরা সন্তান ধারণ করে থাকে।

জরায়ু কক্ষটি যখন শুক্রাণু সঞ্জীবিত ডিম্বানুগুটিকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে, তখন তার আভ্যন্তরীণ নরম মখমলের মতো এনডোমেট্রিয়াম বা অন্তরজরায়ু আস্তরণে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মখমলের মতো নরম ঐ আস্তরণটি পুরু

হতে থাকে এবং রক্তসঞ্চারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার ফলে, ডিম্বানুটি যখন জরায়ুকক্ষের মধ্যে অভ্যর্থিত হয়ে এনডোমেট্রিয়ামের নরম মখমল-আসনে বিশ্রামাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন থেকে ঐ রক্তবেদী থেকেই তার পুষ্টি বৃদ্ধি বিকাশের সব রকম উপাদান অনায়াসেই সংগ্রহ করে নিতে থাকে। জরায়ু-কক্ষের স্থিতিস্থাপকতার ফলে অনেকটা বেলুনের মতোই এটা লম্বা হতে পারে, বেড়ে যেতে পারে, ঠিক যে অনুপাতে ডিম্বানুটি আকারে বড় হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে একটি শিশু হয়ে বিকাশলাভের পথে দিন দিন অগ্রসর হয়।

মেয়েদের কিশোর বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বিকাশের লক্ষণগুলো ছেলেদের চেয়ে বছর দুই আগেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, আর এ জন্যেই ছেলে এবং মেয়েদের দু'পক্ষেরই মনে কিছু না কিছু দুশ্চিন্তা জেগে উঠতেও পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে মেয়েরা হয়তো বুঝতে পারে না–কেন ছেলেরা তাদের নারী সুলভ নব নব বিকাশ লক্ষণগুলোর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না, কিংবা হয় তো ভাবতে পারে, ছেলেগুলো কেন তাদের কাছে খুব শিশুর মতো মনে হচ্ছে।

অন্যদিক থেকে, ছেলেরাও সচকিত হয়ে ওঠে–মেয়েরা ঐ বিকাশ পর্যায়ে কেমন যেন আত্মসচেতনভাবে চলছে ফিরছে, কথা বলছে।

এ বয়সে, মেয়েরা মানসিক অন্তদ্বন্দ্বের ফলে কতকগুলো সম্ভাব্য শারীরিক বিকৃতির অমূলক ভয়-আতঙ্কে বিব্রত হয়ে থাকে। কিছু মেয়ে মনে ভাবে, তাদের বক্ষস্ফীতি খুবই অস্বাভাবিক পরিমাণে হচ্ছে কিংবা আশানুরূপ পরিমানে হচ্ছে না, তাই রোগব্যাধি আর অপুষ্টির আতঙ্কে দারুণভাবে মানসিক পীড়নে সদাজর্জরিত হতে থাকে–কাউকে সাহস করে সে কথা বলতেও পারে না।

এ সময়ে মেয়েদের বুঝিয়ে বলা একান্ত প্রয়োজন যে, তাদের শারীরিক বিকাশের একটি পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার গতিক্রমে বিপুলভাবে জনে জনে ব্যতিক্রম হয়েই থাকে। তাদের বোঝানো দরকার যে, কোনও কোনও মেয়ের শারীরিক বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় কিছুটা আগেই আবার কারও হয় খানিক দেরিতে, এবং এ কথাও বোঝানো উচিত যে, প্রত্যেক মেয়েরই দেহবিকাশের যে গতিক্রম পরিস্ফুট হতে দেখা যাচ্ছে সেটাই তার প্রকৃতিসম্মত গতি।

এ রকম পরিস্থিতিতে মেয়ের মা তাকে স্নেহ-সহানুভূতি দিয়ে খুব সহজেই শেখাতে বোঝাতে পারেন যে, প্রকৃতির কৃপায় যে যতটুকু পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে যথাসময়ে আবার আরও কিছু ভালভাবে পাওয়া যায় এবং জীবনে স্বাচ্ছন্দভাবে সুখ শান্তিকে উপভোগ করা সম্ভব হয়। পরম নিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা যাকে যেভাবে গড়েছেন, তাই সন্তোষ সহকারে মেনে নিলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং সেটাই উচিত।

প্রত্যেক কিশোরী মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালের এ শারীরিক বিকাশ পর্যায়ের বিপ্লবজনিত নানা ভাবনাচিন্তার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার মা তাকে বেশ ভালভাবেই বোঝাতে পারেন যে, কিশোরী মেয়ে থেকে ধীরে ধীরে নারীত্বের পূর্ণবিকশিত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার এ প্রক্রিয়ার কতখানি গুরুত্ব এবং গভীরভাবে ভাবতে গেলে, মেয়েদের নারীসূলভ আচরণ চর্চার ক্ষেত্রে এবং মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে এ বয়ঃসন্ধিকালে কতখানি ধীর-স্থির শান্ত-সংযত হয়ে এ বিপ্লবকে আত্মস্থ করে নিতে হয়। বিচলিত বিব্রত হলে এ শারীর বিপ্লব বিবর্তন তার শুভ ফল প্রদানে বিঘ্নিত হতে পারে।

মেয়েদের রজঃস্রাব

মেয়েদের বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব-বিবর্তন এনে দেয় তাদের মাসিক রজঃস্রাব, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তা নিয়ে কিছু বিশদ আলোচনা একান্তই প্রাসঙ্গিক হবে।

মেয়েদের জীবনে বয়ঃসন্ধি থেকে ৪৫-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ পরিপক্ক ডিম্বানু নির্গত হয় ডিম্বকোষ থেকে। এ কারণেই বোঝা যায়, সন্তান সম্ভাবনা সব ডিম্বানু থেকেই হতে পারে না। ডিম্বানু নির্গমন যখনই হয় অথচ তার পরে ভ্রূণায়ন সংঘটিত হতে পারে না, তখনই অসঞ্জীবিত ডিম্বানুটির বিকৃতি ঘটে এবং জরায়ু গাত্রের কোমল নিরাপত্তামূলক আস্তরণটিরও প্রয়োজন শেষ হয়, ফলে, আস্তরণটি পরিত্যক্ত হতে থাকে। এ প্রক্রিয়াটি যেভাবে সংঘটিত হয়, তারই নাম রজঃস্রাব এবং তার অর্থ হল এই যে, প্রতি ২৮ দিন অন্তর অর্থাৎ আনুমানিক এক মাস অন্তর রক্ত দিয়ে গড়া এনডোমেট্রিয়াম নামে অন্তরজরায়ু আস্তরণটি মেয়েদের জরায়ু-গাত্র থেকে বর্জিত হয়ে যোনিপথে বেরিয়ে আসে।

ডিম্বকোষে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ডিম্বানু থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিমাসে একটি ডিম্বানু পুষ্ট হয়ে ডিম্বকোষ থেকে নির্গত হয়। সেটিকে টেনে নেয় ফ্যালোপিয়ান নালী মুখের ছোট ছোট আঙুলের মতো প্রত্যঙ্গগুলো এবং ডিম্বানুটি জরায়ুর দিকে এগুতে থাকে।

ডিম্বকোষের হরমোন রসের প্রভাবে জরায়ু গাত্রে এনডোতেমিট্রিয়াম দ্বারা অন্তজরায়ু রক্তের আস্তরণ তৈরি হয়। পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বানু নিষিক্ত হলে ভ্রূণায়ন শুরু হয় এবং এ আস্তরণে আশ্রয় নিয়ে শিশুর পুষ্টিলাভ হতে থাকে।

ডিম্বানুর ভ্রূণায়ন না হলে জরায়ুর এনডোমেট্রিয়াম স্তরের আর প্রয়োজন থাকে না। তখন সেটি রক্তধারা রূপে যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ রজঃস্রাব সাধারণত ২৮ দিন অন্তর হয় এবং বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ৪৫-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত হতে থাকে।

যদিও মাসিক রজঃস্রাব চলতে থাকে তিন থেকে পাঁচ দিন যাবৎ এবং তখন এনডোমেট্রিয়াম আস্তরণটি জরায়ু থেকে বর্জিত হতে থাকে, তবে রজঃস্রাব প্রক্রিয়ায় প্রকৃত সূচনা ঘটে ডিম্বানু নির্গমণের সময় থেকেই আর সমাপ্তি ঘটে স্রাব নির্গমনের সঙ্গে। ডিম্বানুর ভ্রূণায়ন না হলে এ রজঃস্রাবের আবর্ত ফিরে ফিরে আসে।

এ আবর্ত কুড়ি দিন থেকে পঁয়ত্রিশ দিন অন্তরেও আসতে পারে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। অনেক কিশোরী মেয়ে দারুণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যথাসময়ে রজঃস্রাব না হলে। এ অনিয়ম অবশ্যই সব মেয়েদের জীবনে কোন না কোন সময়ে দেখা যায় এবং পূর্ণবয়স্কা মহিলাদের জীবনেও আসে। তবে, সাধারণ বয়ঃসন্ধিকালের শেষের দিকে মেয়েদের এ অনিয়ম অনেকটা নিয়মিত হয়ে আসে এবং তখন তারা পরবর্তী মাসের রজঃস্রাবের সময়টাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখে নেয়।

ডিম্বকোষ, ফ্যালোপিয়ান নালী এবং জরায়ু–এ তিনটির সঙ্গে মেয়েদের যোনি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়েছে জনন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীন ব্যবস্থা। যোনিপথটি খুবই নরম, স্থিতিস্থাপক (প্রসারিত হলেও আগের অবস্থা ফিরে পায় এমন নমনীয়) একটি নালীর মতোই–এরই মধ্যে দিয়ে রক্তঃস্রাব নেমে আসে, আবার এ পথ দিয়েই মাতৃজঠর থেকে সন্তান হয় ভূমিষ্ঠ। এ যোনিপথেই যৌনসঙ্গমের সময়ে মেয়েদের জনন প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের শুক্রাণুসহ বীর্যরস অর্পন করা হয়ে থাকে।

কিশোরী মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যোনিপথ এবং তার পারিপার্শ্বিক বহিরাঙ্গগুলোও পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ করে, প্রজননের উপযোগী সক্ষমতা অর্জন করে এবং বয়স্ক জীবনের উপযুক্ত যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুতি পর্যায়ে উপনীত হয়।

যোনিমুখে একটি পেশীঝিল্লী আছে, সেটি বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। তবে সাধারণত এ যোনি-ঝিল্লী বা পর্দার আকৃতি অনেকটা আংটির মতো গোল। এটা পাতলা পর্দার মতো হতে পারে, কখনও বা হয় অত্যন্ত কর্কশ, আবার জন্ম থেকেই এটা না থাকতেও পারে।

এ ঝিল্লীটিকে বলা হয় হাইমেন বা ভগচ্ছদ। মনে করা হত, এ ঝিল্লীটি অক্ষত অবস্থায় থাকলে বুঝতে হবে মেয়েটি কোনও যৌন সঙ্গম করেনি। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে, এ ধারণা অমূলক। কারণ, অনেক সময়ে শারীরিক কাজকর্মের রুক্ষতা বা তীব্রতার জন্যে মেয়েদের যোনিমুখের ঐ পাতলা ভগচ্ছদ পেশীঝিল্লীটি ছিঁড়ে যেতেও পারে, কোনও রকম ব্যথা-যন্ত্রণা ছাড়াই।

আবার অনেক ক্ষেত্রে, মেয়েরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে রজঃস্রাবের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কাপড়ের টুকরো যৌনি পথে ঢুকিয়ে রাখে এবং সেভাবে কাপড়ের টুকরো গুঁজে দেওয়ার জন্য ঘর্ষণের ফলেও অনেক সময়ে ভগচ্ছেদ বা হাইমেন পর্দাটি ছিঁড়ে যায়, কিংবা যোনিপথের রহস্য উপলব্ধির চেষ্টায় কিশোরী মেয়েরা কৌতুহলী হয়ে নিজেই আঙুল দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ঐ হাইমেন ছিঁড়ে যেতে পারে। সুতরাং ভগচ্ছেদের ঝিল্লীপর্দা ছেঁড়া থাকলেই সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, মেয়েটি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল।

যোনিমুখের ঠিক ওপরেই থাকে মেয়েদের মূত্রনালী মুখ। ছেলেদের মতোই, মূত্রাশয় থেকে এই মূত্রনালীমুখ পর্যন্ত পথটিকে বলে মূত্রনালী বা ইউরেথ্রা। এ মূত্রনালীমুখের ওপরেই একটি অতি সংবেদনশীল সামান্য উঁচু স্নায়ুতন্তু সমষ্টি আছে, যাকে বলা হয় ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটরিস। যেহেতু যৌন-সংবেদনশীল অনেকগুলো স্নায়ুতন্ত্র এ ভগাঙ্কুরে সমবিষ্ট হয়ে রয়েছে, সে কারণে মেয়েদের দেহের যৌন উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল হল এ ক্ষুদ্র অংশটি। স্পর্শ দিয়ে উত্তেজিত করলে এ ভগাঙ্কুরটি সামান্য পরিমাণে উৎক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করে এবং মেয়েদের চরম যৌন পুলক অনুভূতি লাভের সহায়ক হয়।

এ ভগাঙ্কুর (ক্লাইটরিস) এবং যোনিপথ আবৃত করে থাকে দুটি সমান্তরাল পাতলা চামড়া, যার নাম ভগদ্বার (ভাল্‌ভা)। কিশোরী মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণের পর থেকে যতই সে বয়স্ক পরিণতির পর্যায়ে এগিয়ে চলতে থাকে ততই দেখা যায় এ ভগদ্বার দুটির আবরণ দু'পাশে খুলে যাচ্ছে। এর ভেতরেই থাকে ভগৌষ্ঠ নামে দুটি ছোট ছোট ঠোঁটের মতো প্রত্যঙ্গ, যেগুলো খুবই সংবেদনশীল এবং এগুলোরও উপযোগিতা হল গুরুত্বপুর্ণ যোনিপথকে বীজাণু-দূষণ থেকে সুরক্ষিত রাখা।

আগেই বলা হয়েছে, মেয়েদের যৌবনাগমনকালে রজঃস্রাবের নির্দিষ্ট কঠোর সময়সূচি নেই। সময়ের কম বেশি অনেকটাই হয়ে থাকে। অনেক মেয়ে মাত্র ন'বছর

বয়সেই রজঃদর্শন করতে পারে, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ১৬-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতেও হয়। অধিকাংশ কিশোরী মেয়ের জীবনেই ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যেই রজঃদর্শন হতে দেখা যায়।

যাইহোক, কোনও মেয়ের মা তাঁর নিজের কৈশোর জীবন বিকাশের বয়ঃসন্ধিকালে যে-বয়সে রজঃদর্শন করেছিলেন, তাঁর মেয়ে তার চেয়ে কম বয়সেও রজঃস্বলা হতে পারে। শারীর বিজ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য করছেন যে, বিগত প্রজন্মের মেয়েদের প্রথম মাসিক রজঃস্রাবের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তাঁরা বলছেন, নুবিজ্ঞানের সামাজিক বিবর্তনের পটভূমি আবহাওয়া, এমন কি আহার্য পুষ্টির প্রভাবেও মাসিক রজঃস্রাবের সময়সূচিতে কম-বেশি পার্থক্য দেখা দেওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়।

অধিকাংশ কিশোরী মেয়ে তাদের বয়ঃসন্ধিকালে দেহের প্রধান প্রধান পরিবর্তন সূচক লক্ষণগুলো দেখে তাদের পূর্ণ নারীত্বের মর্যাদা মনে করে সাগ্রহে মেনে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, শারীরিক দিক থেকেও কোনও কিশোরী মেয়ের বয়স্ক জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্যে আরও খানিকটা সময় লাগে। সন্তান ধারণের উপযোগী দৈহিক ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রথম রজঃস্রাব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জিত হয় না–আরও দু'তিন বছর লাগে পরিণত হতে।

তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব বহন করে কোনও কিশোরী-মেয়ের জীবনে যখনই প্রথম রজঃদর্শন ঘটে, তখনই তার যৌবনান্মুখ জীবন-বিকাশের ধারায় এক অতি বিপুল নাটকীয় পরিবেশের সূচিত হয়। তখন থেকেই কিশোরী-মেয়েকে মেনে নিতে হয় তার নতুন দৈহিক পরিবর্তনগুলোকে সহজে স্বাচ্ছন্দ মানসিকতা দিয়ে। তার শরীরের মধ্যে নানা রকমের সঞ্জীবনী হরমোন রসক্ষরণ, নব-উন্মেষিত যৌন পূলক অনুভূতি, আর যত শীঘ্র সম্ভব সামাজিক এবং যৌন সম্পর্ক জনিত পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, তার সমবয়সীদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান উৎসাহ-উদ্দীপনার সম্মিলিত পরিণামে প্রত্যেক কিশোরী মেয়েকে এ সময়ে বিপুল টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার কাছে নিত্য নতুন গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে থাকে।

এ সব মিলিয়ে কিশোরী মেয়ের কোনও কোনও ভাবভঙ্গি, আচার আচরণ এমনই অবাধ্য, এমনই সামঞ্জস্যবর্জিত মনে হতে থাকে যে, তাকে ঘরের পরিবেশে আগে যেমনটি সংযত সুশীলা দেখা যেত, তেমনটি আর দেখা যায় না।

যদিও কিশোরী-মেয়েরা রজঃস্বলা বয়সে বেশ দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মায়েদের মাসিক রজঃস্রাবের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি থেকে অনেক কিছু জেনে বুঝে নেয় কিংবা মাকে এ-কথা সে কথা জিজ্ঞাসা করে, তবুও তাকে এক আধবার এ নিয়ে শারীর বিজ্ঞান সম্মত সৎ পরামর্শ দিয়ে রাখা একান্তই প্রয়োজন। মায়েরা অবশ্যই তাদের কিশোরী-মেয়েদের বুঝিয়ে দেবেন–রজঃস্বলা হওয়ার সময়ে যৌনাঙ্গে কি ধরনের আবরণ পরতে হয়, কিভাবে যোনি পরিচ্ছন্ন রাখা যায়–ইত্যাদি অপরিহার্য কয়েকটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরী-মেয়েরা যে সব কারণে তাদের প্রক্ষোভ আবেগ জরিত সমস্যায় নিজেরা দুঃখ-কষ্ট পায় এবং বড়দেরও অনেক দুঃখ দেয়, সেগুলোর মধ্যে মূলগত কারণ হল–তাদের শরীরে এ সময়ে অতি দ্রুত অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটাতে

থাকে, এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সব পরিবর্তনগুলো এমনই আকস্মিকভাবে একটির পর একটি তাদের দেহে জেগে ওঠে যে, তাদের অনুভূতি দিয়ে সেগুলোর বিশ্লেষণ করার যথাযথ সময়ও পায় না।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীরা যে নতুন দেহ-সৌষ্ঠবটি অর্জন করে, তার অভিজ্ঞতাও অকস্মাৎ ঘটে এবং সেই নতুন দেহজনিত সমস্যাদির মোকাবিলা করার মতো মানসিক প্রস্তুতির যথার্থ সময় পায় না। তার ফলে, তাদের মনে নানা রকম যৌন ভাবনা-চিন্তা এবং উৎকণ্ঠার জাল ছড়িয়ে পড়ে।

যৌন অনুভূতির অভিপ্রকাশ প্রধানত কৈশোর জীবনে ঘটে হস্তমৈথুন অর্থাৎ স্বকামচর্চার পথ বাহিত হয়ে। এ স্বকামচর্চার মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা নিজেদের যৌন ব্যক্তিসত্তার যাচাই করে নিতে চায়।

আরও জেনে রাখা ভাল যে, অনেক সামাজিক প্রক্ষোভজনিত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পেছনে কোনও যৌনতার সম্পর্ক-সম্বন্ধ না থাকলেও, প্রায়ই সেই প্রক্ষোভের প্রভাবে যৌন অনুভূতির তীব্রতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাগে। এরই ফলে, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব বা স্কুলে কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব মনোমালিন্য হলেও কিশোর-কিশোরীরা হস্তমেহন করে সেই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে চায়।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দেহ-মনে যে যৌন অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার কারণ হল–লিঙ্গ, যোনি, ভগাঙ্কুর, স্তনদেশ প্রভৃতি যৌন-সংবেদনশীল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্নায়ু-শীর্ষগুলো খুব বেশি পরিমাণে পরিণতি লাভ করতে থাকে। তাই ক্রমশই সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এ কারণেই এসব বিচিত্র অনুভূতির প্রকৃত রহস্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তারা অনেক কিছু জানতে চায় যৌণাঙ্গ সম্বন্ধে, বিশেষ করে ছেলে এবং মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের মানদন্ড সম্বন্ধে।

মনে রাখতে হবে, এ গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা যৌনতা সম্পর্কিত যে সব কথা জানতে চায়, সেগুলো মোটেই অশ্লীল চর্চা নয়–নির্দোষ সরল মনে তারা জীবনের বিবর্তন-বিকাশের রহস্যই জানতে চায় নিতান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই।

সুতরাং সহানুভূতিশীল এবং বুদ্ধি সম্পন্ন মা-বাবা অভিভাবক শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের যৌন সংক্রান্ত প্রশ্নাদির সম্মুখীন হলে বিচলিত হবেন না মোটেই। কখনও কিশোর-কিশোরীরা তাদের শারীর-বিকাশের যৌনতা সম্পর্কিত প্রশ্ন তুলে ধরলে বড়রা মোটেই তিরস্কার করবেন না, বা ভয় দেখাবেন না। তিরস্কার কিংবা ভয় দেখালে তাদের যৌন তথ্য আহরণের আগ্রহ বিকৃত পথ গ্রহণ করতে পারে, যেটা তাদের পক্ষে হবে বিষম ক্ষতিকর।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী ডঃ সনমুগম্ সম্প্রতি পরিণত কৈশোর জীবন-বিকাশের পথে ব্যক্তির গঠনের নানা রকম সমস্যা নিয়ে রচিত তাঁর এক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এদেশের কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল পর্যায়ে এ ধরনের শারীরিক মানসিক বিবর্তনের ফলে তাদের প্রাক্ষোভিক স্থৈর্যরক্ষা এবং ব্যক্তির গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সত্যিই বিশেষ গুরুতর প্রভাব সক্রিয় হয়ে থাকে। এ বিষয়ে তারা যথাসময়ে পথ নির্দেশ না পাওয়ার ফলে তাদের আবেগ-প্রক্ষোভ উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত হয়ে বড়দের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ সনমুগম, বিভিন্ন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে স্টানলী হল, লুয়েলা, কোল সারলোৎ ব্যুহলার, আব্রামসেন, স্তোল্‌ৎজ্ প্রভৃতি গবেষকদের এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিবর্তন পরিবর্তনের আকস্মিকতায় কিশোর-কিশোরীদের আবেগ-প্রক্ষোভ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

তবে, আশার কথাও ডঃ সনমুগম্ শুনিয়েছেন এ বলে যে, পক্ষান্তরে অন্যান্য কয়েকজন স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নোভাক্ গ্রেহুইচ, ডেনিস, এবং ফ্রেমি অবশ্য তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখেছেন, সকল ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালের এসব গুরুতর আকস্মিক বিবর্তন কিশোর-কিশোরীদের মনের ওপর তেমন কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

এই আশার কথা যে অমূলক নয়, তা বড়রা তাঁদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চয়ই যাচাই করে দেখতে পারেন। কিন্তু তা হলেও যথাসময়ে কিশোর-কিশোরীদের সব রকম সম্ভাব্য আকস্মিকতার প্রাক্ষেভিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য সৎ পরামর্শ দিয়ে রাখা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

এ ধরনের দ্বিমতের ভিত্তিতে ডঃ সনমুগম্ কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ পর্যায়ে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের দুটি শ্রেণীবিভাগ করতে চেয়েছেন ঃ

১) বয়ঃসন্ধিকাল প্রভাবিত গোষ্ঠী (পিউবারটি গ্রুপ),

২) বয়ঃসন্ধিকাল-প্রভাবমুক্ত গোষ্ঠী (নুন-পিউবারটি গ্রুপ)।

বয়ঃসন্ধিকাল প্রভাবিত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে যে সব প্রাক্ষেভিক বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে, সেগুলো হল-

১) অতি সচেতনা এবং স্পর্শকাতরতা,

২) উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা,

৩) ঘুমের ব্যাঘাত, এবং

৪) বাস্তব জীবন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস প্রচেষ্টা।

এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা, ঘুমের ব্যাঘাত এবং বাস্তব জীবন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার উদ্যোগে-প্রচেষ্টা নিয়েই বেশি মনোযোগ দিতে হয়, কারণ এগুলো কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিত্ববিকাশে নিদারুণ প্রভাব বিস্তারের জন্য দায়ী হয়ে থাকে।

আর, বয়ঃসন্ধিকাল প্রভাবমুক্ত কিশোরী-কিশোরীদের যে সব প্রাক্ষেভিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হল।

১) অতি-সচেতনতা এবং স্পর্শকাতরতা,

২) ভাবাবেগজনিত উত্তেজনা।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বয়ঃসন্ধিকাল প্রভাবমুক্ত। কিশোর-কিশোরীদের এ ধরনের আবেগ-প্রক্ষেভজনিত বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে যথাযোগ্য সহযোগিতার মাধ্যমে সার্থকতায় পর্যবসিত হতেও পারে। মনোবিজ্ঞানী ডানবার এবং থমসন এ মতবাদ সমর্থন করেছেন।

বয়ঃসন্ধিকালের এসব গুরুত্ব যদি মা বাবা বা অভিভাবকরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, যদি মনে করেন-ওসব তো ছেলেমেয়েরা আপনা থেকেই মানিয়ে নিতে পারে, তাহলে বিষম ভুল করবেন, কারণ অনেক ছেলে-মেয়ের কৈশোর জীবন পর্যায়ের এ সন্ধিকালে বড়দের যথাযোগ্য সহযোগিতা সহানুভূতির অভাবে কিশোর-কিশোরীরা সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, নানাভাবে বিকারমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়তেও পারে, লক্ষ্য করা গেছে।

কিশোর বয়সে যৌন ধারণা

পরম পরিতাপের বিষয় এ যে, আমরা ছেলেমেয়েদের পারিপার্শ্বিক বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সব কিছু বিষয় নিয়ে শিক্ষাদীক্ষার বিপুল ব্যাপক আয়োজন করে চলেছি, অথচ তাদের নিজেদের দেহ-মনের খবর ঠিকমতো জানবে শিখবে কিভাবে, তা নিয়ে তেমন করে তালিম দেবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে করিনি।

বিশেষত, কিশোর বয়সের বিকাশধারার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার সময়ে ছেলেমেয়েদের যে সব শারীরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে, যার ফলে তারা নিজেদের একেবারেই 'অন্য মানুষ' বলে ভাবতে শুরু করে–সেই সব পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল যৌন অনুভূতির যে ধারণা, তা নিয়ে আমরা নিজেরাই ভেবে থাকি খুব কম।

বড়দের মধ্যে অনেকেই জানেন না, কিশোর বয়সে যৌন ধারণার উন্মেষ ঘটার সময় ছেলেমেয়েরা নিজেদের কতখানি দ্বিধাগ্রস্ত, কতখানি দোষী মনোভাবাপন্ন মনে করে। মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন না, যৌনতার ধারণা কিশোর-কিশোরীদের কাছে কী অপরিসীম রহস্যময় অভিজ্ঞতা বহন করে আনে।

যখন একদিকে কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের দেহের মধ্যে মৃদুভাবে যৌন পুলক অনুভূতি জাগতে থাকে, যৌনাঙ্গের সংবেদনশীলতা তারা উপলব্ধি করতে পারে, এবং সেই সঙ্গে অন্যদিকে ছেলে ও মেয়েরা বুঝতে পারে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে–তখন, তাদের কাছে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যৌনতার দৈহিক উপলব্ধির সঙ্গে পারস্পরিক সামাজিক আকর্ষণ বোধের কোথাও যেন একটা সম্পর্ক আছে। এভাবেই তাদের মনে যৌনতার নিজস্ব ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে।

অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোরীরা অবশ্য 'যৌনতা' কথাটার মানেই জানে না–কথাটা হয়তো আদপে শোনেও নি। কথাটা শুনে থাকলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা তাদের মনে সম্ভবত হয়ে থাকে যেন ঐ কথাটা দিয়ে কোন একটা নিষিদ্ধ বিষয় বোঝানোই হচ্ছে।

এ রকম অস্পষ্ট অস্বচ্ছ ত্রুটিপূর্ণ ধারণা ছেলেমেয়েদের মনে বাসা বেঁধে থাকতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। বড়রা একটু সহানুভূতি দিয়ে চিন্তা করলেই খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে, অবুঝ কিশোর কিশোরীদের দেহ বিকাশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায়ে অকস্মাৎ তাদের যৌনাঙ্গের যে বিচিত্র পুলক অনুভূতির উপলব্ধি জাগে আপনা হতেই, সেটাকে যদি ঘৃণ্য নিষিদ্ধ নিন্দনীয় ইত্যাদি ধারণা দিয়ে তাদের বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে প্রকৃতির দেওয়া শরীরটাকেই তো তারা ঘৃণা করতে চাইবে। যৌন অনুভূতির প্রতি ঘৃণামূলক মনোভাব এবং ধারণা সৃষ্টি করা এ কারণেই বর্জনীয় মনে করাই উচিত।

অনেক কষ্ট সহ্য করে ছেলেমেয়েদের বড় হতে হয় এবং সেই বড় হয়ে ওঠার একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায় হল এ যৌণ ধারণার উন্মেষ পর্যায়। এ পর্যায়ে আমাদের

নিজেদের কিশোর জীবনের অসহায় টানাপোড়েনের কথা আমরা বড় হয়ে ভুলে যাই। ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ওপর আমাদের সহানুভূতি হারাই। আমরা ছেলেবেলায় কত মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছি যৌনতা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা নিয়ে, সেই কথা যদি মনে করতে পারি, তা হলে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতার ধারণা সঠিক সময়ে পরিচ্ছন্নভাবে গড়ে দেবার প্রয়াস পেতে পারি। আমাদের বোঝা উচিত, কিশোর কিশোরীদের যৌনতা সম্পর্কিত ধারণা ঠিক মতো গড়ে না তোলার জন্য বড়রাই দায়ী।

ছোট ছেলেমেয়েদের কৈশোর বিকাশ পর্যায়ে যখন যৌন চেতনার উন্মেষ ঘটে, তখন বড়রা চমকে ওঠেন। পনের বছরের ছেলেকে বাবা যেদিন স্বমেহন করতে অর্থাৎ হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ নিয়ে প্রচন্ডভাবে নাড়তে দেখলেন, সেদিন তিনি খুব ভয় পেয়ে কি করবেন ভেবে পেলেন না। হয়তো তিনি ছেলেকে ধমকে দিলেন, না হয়, ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ছুটলেন।

এ রকম ঘটে থাকে, তার কারণ ছেলেবেলা থেকেই বড়রা জেনে এসেছেন যে হস্তমৈথুন বা স্বমেহন খুব খারাপ যৌন অভ্যাস। বড়রা এর জন্যে অনেকেই ছেলেবেলায় তিরস্কৃত হয়েছেন। কেউ যদি এখন বলেন, ওতে কোনও দোষ নেই, ওটা প্রকৃতির সঙ্কেত এবং একটা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় অনুভূতি, তাহলে বড়রা বিশ্বাস করতেই চাইবে না।

বড়দের সেই ধারণাই কিশোর-কিশোরীদের যৌন ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং স্বমেহন অভ্যাসকে তারা সেই জন্য গোপনেই চর্চা করে চলে, ছাড়তে পারে না।

ছেলেবেলায় কেউই এ সম্পর্কে তাদের যৌন অনুভূতি বা চেতনার কথা সাহস করে মা বাবাকে বলতে পারে না। কিন্তু কিশোর বয়সে এ বিষয়ে বেশ পরিষ্কার ধারণা ছেলেমেয়েদের মনে জেগে উঠতে থাকে যে, তাদের কারোর দেহে যৌন লিঙ্গ আছে, আবার কারোর দেহে তা নেই। এ রহস্যের কারণ তারা ছেলেবেলা থেকেই জানতে চায়, কিন্তু যৌনতা সম্পর্কে কোনও বিজ্ঞানসম্মত ধারণাই তখন তাদের গড়ে ওঠে না। তবু এ নিয়ে বড়দের কাছে কোনও প্রশ্ন করলেই তারা ভ্রুকুটি লাভ করেই থাকে।

যদি কিশোর-কিশোরীদের মনে যৌনতা বিষয়ে এমনি সুপরিকল্পিতভাবে বড়রা গোপনীয়তার ধারণা বদ্ধমূল করে দেন, তাহলে তারা কোন দিনই মন খুলে তাদের যৌন সমস্যার কথা, যৌনতা সম্পর্কিত কোনও দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তির কথাও বড়দের কাছে বলতে সাহস পাবে না। এর ফল অবশ্যই খুব খারাপ হবে ছেলেমেয়েদের জীবনে এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমাজ জীবনে।

কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি যে, যৌন অনুভূতি উপলব্ধির পেছনে একটা বিপুল সৃজনী শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং তার আকর্ষণেই মানুষের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সভ্যতা সংস্কৃতির মূল উপাদান হল সেই পারস্পরিক আকর্ষণবোধ, তাহলে কৈশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের সেভাবেই ধারণা গড়ে দিতে পারি। আমরা কিশোর-কিশোরীদের বলতে পারি–তারা বড় হয়ে উঠছে, তাই দেহে মনে কত রকমের নতুন অনুভূতি জাগতে থাকবে, সে সবই তাদের বড় হয়ে ওঠারই শক্তি জোগাবে। তাহলে তারা যৌনতার অনুভূতিকেও একটা শক্তি বলেই গোড়া থেকে ভাবতে শিখবে এবং যৌনতা সম্পর্কে সে ধারণাটাই সত্যিকারের শুভদায়ক মঙ্গলময় ধারণা।

যৌনতা সম্পর্কে এ ধরনের শক্তিভিত্তিক ধারণা কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবা অভিভাবক শিক্ষক সকলেই একযোগে ছেলেমেয়েদের বোঝাতে থাকেন এমন অস্পষ্টভাবে, যাতে এ সম্পর্কে তাদের মনে অহেতুক পাপভিত্তিক ধারণাই গড়ে ওঠে।

কিশোর বয়সে যখন ছেলেমেয়েদের দেহে যৌনতায় উন্মেষ ঘটতে থাকে, তখন অবশ্যই তা নিয়ে তারা কৌতূহলী হবে। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার পথে বড়দের সহায়তা পাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বড়রা সহায়তা করেন না; বরং কৌতূহল দমন করতেই চেষ্টা করেন। তাই ছেলেমেয়েরা যৌনতা সম্পর্কে পাপবোধই গড়ে তোলে।

বাস্তবক্ষেত্রে, বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বড়রা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কিশোর বয়সের যৌন ধারণা গড়ে ওঠে সমাজের পরিবেশ থেকেই। আগেই বলা হয়েছে, কৈশোর পর্যায়ে ছেলে এবং মেয়েরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে স্বাভাবিক ভাবেই। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় এবং সিনেমার চিত্রে, টেলিভিশনে তারা নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মধুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে থাকে।

সেই সঙ্গে তাদের পারস্পরিক কৌতূহল মিশ্রিত আকর্ষণও বেড়ে ওঠে, যখন তারা দেখে এবং জানতে পারে যে, ছেলে এবং মেয়েদের যৌনাঙ্গের গঠনও বিভিন্ন রকম। তারা চিরন্তন জৈব ধর্ম অনুসারেই এর কারণ জানতে চায়, বিস্মিত হয়। কিন্তু তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করলেই বড়দের কাছ থেকে বাধা পেয়ে থাকে।

ফলে, যৌনতা সম্পর্কে অনেক বিকৃত ধারণা কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মনে জেগে ওঠে। প্রখ্যাত মনঃসমীক্ষক সিগম্যন্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন, মেয়েরা তাদের যৌনাঙ্গে ছেলেদের মতো লিঙ্গ দেখতে না পেয়ে অনেক সময়ে এক ধরনের যৌন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কষ্ট পায়, তাকে বলে লিঙ্গচ্ছেদ উৎকণ্ঠা (ক্যাসট্রেশন অ্যাংজাইটি)। এ অমূলক উৎকণ্ঠা ছেলেদের মধ্যেও নাকি প্রচ্ছন্নভাবে জাগতে পারে, এ ভেবে যে মেয়েদের লিঙ্গ বুঝি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রয়েড তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনঃযৌন তত্ত্বে বলেছিলেন, যৌন ধারণা হল প্রাণশক্তির উপলব্ধি (লিবিডো)। মানুষের যতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি আছে, প্রাণ শক্তিভিত্তিক এ যৌন প্রবৃত্তি হল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। বয়স অনুযায়ী এ প্রবৃত্তিগত অনুভূতি দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিণ্ন পর্যায়ে অনুভূত হয়ে থাকে। শৈশবে এ যৌন ধারণা আবদ্ধ থাকে মুখে, বাল্যকালে মলদ্বারে, এবং কৈশোর তারুণ্যে অনুভূত হয় যৌনাঙ্গে।

কিন্তু এটা যে প্রাণশক্তি, এ রকম সুস্থ স্পষ্ট কোনও ধারণাই ছোটদের মনে জন্মায় না, এমন কি কৈশোরেও নয়। বৈদিক সভ্যতায় আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের বিধিবদ্ধ জীবনধারার মাধ্যমে ছোটদের শেখানো হত–যৌন সংযমের চর্চা করে প্রাণশক্তি স্বরুপ বীর্যকে রক্ষা করতে হয়। কারণ গীতার শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে বলা হয়েছে, সকল প্রাণীর মধ্যে যে যৌনশক্তি আছে, তাহলো ঐশ্বরিক প্রাণশক্তি ('ভূতেষু কামঃ অস্মি'–গীতা ৭/১১)। যৌনতা সম্পর্কে এমনই মহান ধারণা সৃষ্টি করা হত প্রাচীন ভারতে ছেলেবেলা থেকেই। সুতরাং তখন ছেলেমেয়েরা নিজেদের এবং পরস্পরের যৌনতাকে দারুণ সমীহ করত।

কিন্তু বর্তমান যুগে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার সকল বয়সেই সামাজিক সংস্কার বশে ছেলেমেয়েরা যৌন ধারণার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কতগুলো অশুভ অকল্যাণকর চিন্তা ভাবনাই জড়িয়ে ফেলে। বড়রা বলেন, বয়স হলে ওরা ঠিকই সব কিছু বুঝতে পারবে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, আপনা হতে সঠিক সব কিছু বুঝতে পারবে। তবে

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, আপনা হতে সঠিক যৌন ধারণা খুব কম কিশোর-কিশোরীর মধ্যেই জেগে ওঠে। সব ছেলেমেয়েই যোনি-লিঙ্গ সম্পর্কিত কথায়, এমন কি যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের কথাতেও সঙ্কোচ বোধ করে থাকে–যেন কোনও এক বিষম গোপনীয়তার ষড়যন্ত্রের মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে।

ফ্রয়েড তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় অস্পষ্ট যৌন ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলেরা মায়ের প্রতি এবং মেয়েরা বাবার প্রতি স্নেহ-ভালবাসার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সেই আকর্ষণে কিছুমাত্র যোনি-লিঙ্গ সম্পর্কের ধারণা তাদের মনে থাকে না। শুধুই ছেলেরা মায়ের আচার-আচরণ, কথাবার্তা সাজপোশাক সব কিছু খুব ভালবাসে আর অনুকরণ করে, এবং মেয়েরা তাদের বাবার সব আচরণ ভঙ্গি, স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।

ফ্রয়েডের বিশ্বাস ছিল, এ ধরনের বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলেই মানুষের মনে সহজ স্বাভাবিক উভকামিতা (হোটেরোসেকসুয়ালিটি) জাগা সম্ভব হয়–যেটা সুস্থ যৌন ধারণার গুরত্বপূর্ণ ভিত্তি স্বরূপ বিবেচিত হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে স্বাভাবিক বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে ছেলেমেয়েরা পরবর্তী কৈশোর পর্যায়ে সমকামিতা (হোমোসেকসুয়ালিটি) অর্জন করে বিকৃত যৌন ধারণার কবলে পড়তেও পারে। তখন ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথেই শুধু যৌন ভাব বিনিময় করতে চাইবে–সেটা নিশ্চয়ই সমাজ জীবনে সুস্থতার লক্ষণ বলে প্রতিপন্ন হবে না।

প্রকৃতপক্ষে, 'যৌনতা' বলতে যোনি-লিঙ্গ সম্পর্কের ধারণাটাই সব কিছু নয়। যৌনতার ধারণা হওয়া উচিত বৃহত্তর সুস্থ পরিবার সমাজ ভিত্তিক সুসম্পর্কের ধারণা। কিশোর বয়সে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সেই সুষ্ঠু ধারণাটাই জাগিয়ে দেওয়া উচিত যে, ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করাই হল সমাজ জীবনের সুখ-শান্তির অন্যতম অপরিহার্য মূল আচরণ-চর্চা।

সুখের কথা, এ আচরণ-চর্চা অনেক ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিকভাবেই বিনা উপদেশে ছেলেমেয়েরা কিশোর-বয়সে ধীরে ধীরে শুরু করতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবা অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের এক ভিন্ন আদর্শের অনুসারী হয়ে সেই স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করেই বসেন।

অতি অল্প বয়সের ছেলে এবং মেয়েরা কাছাকাছি এলেই, আলাপ করলেই অনেকে এমনই সচকিতভাবে তাদের তফাৎ করে দিতে চান যেন তারা এখনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ যে এক ধরনের 'গেল-গেল'-ভাব, এটাই কিশোর বয়সের যৌন ধারণা স্বাভাবিকভাবে গড়ে তুলতে বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে, এ ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পরিবেশ রচিত হয় স্কুলে, ছোটদের সঙ্ঘ-সমিতিতে। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এমনও হয়েছে যে, ছেলে এবং মেয়েরা এক সঙ্গে খেলা করছে এবং সঙ্ঘের কর্মী তাদের পরিচালনা করছে–সেখানে কোনও ছেলে এবং মেয়ে একটু কাছাকাছি হয়ে খেলা সম্পর্কেই হয়তো একান্তে একটু কথা বলেছে–অমনি উপস্থিত কোনও আদর্শনিষ্ঠ অভিভাবকস্থানীয় লোক ধড়ফড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে তেড়ে এসে পরের ছেলেটিকে ধমকে দিলেন, 'খবরদার; বেচাল দেখি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!'

অভিভাবকটি নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, ঐ ছোট ছেলেটি তাঁর ছোট মেয়েটিকে কিছু বদ কথা, বদ্ মতলব দেবার জন্যেই কাছে গিয়ে কথা বলছিল। দৃষ্টান্তটি বাস্তব জীবন থেকেই সংকলিত–এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা ছেলেমেয়েদের জীবনে নানাভাবে ঘটছে বলেই তারা অল্প বয়স থেকেই ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার স্বাভাবিক আগ্রহকে অস্বাভাবিক, নিন্দনীয় বলেই ভাবতে শেখে।

সুসম্পর্ক বোধ থেকেই কৈশোর জীবনে যৌনতার উন্মেষকাল সুস্থ যৌন সম্পর্কের ধারণাটিও সুসংবদ্ধ সামাজিক চেতনার মতোই জেগে ওঠা সম্ভব। কিন্তু বড়দের এ ধরনের 'বজ্র আঁটুনি' কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ যৌন ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বভাবতই 'ফস্‌কা গেরো' হয়েই থাকে। সঠিক যৌন ধারণা যথাসময়ে কিশোর বয়সে গড়ে দিতে সঙ্কোচ এবং অনীহা বোধ করেন বলেই এ ধরনের নেতিবাচক আচরণ করে থাকেন।

মানুষের জীবনে যৌনতা যখন অপরিহার্য বলেই স্বীকৃত, তখন কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক কৌতূহলের সাথে সাথেই সুস্থ যৌনতার ধারণা সৃষ্টি করে দিলে ভালই হবে। তার মানে এ নয় যে, নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গমের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সরাসরি তাদের বোঝাতে বসে যেতে হবে। যৌনতার ধারণা বলতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং যৌন বোধের উন্মেষ সম্পর্কে সুস্থ সংযত আচরণ-চর্চার অনুশীলন বোঝায়। সেটাই কিশোর-কিশোরীরা পেতে চায়, শিখতে চায়।

যেহেতু যৌনাঙ্গটি থাকে মলমূত্র ত্যাগের অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের সঙ্গে সন্নিহিত, তাই এক ধরনের অপরিচ্ছন্নতার ঘৃণাবোধ জড়িয়ে থাকে যৌনতাবোধের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে। এ ধারণাও বড়দের সৃষ্টি। লিঙ্গ থেকে বা যোনিপথের কাছ থেকে মূত্রত্যাগ করা হয় বলে মূত্র নির্গমনের মতো ঘৃণার ব্যাপার নয় এ যৌনতাবোধ, সেই ধারণা ছেলেবেলা থেকেই গড়ে দিলে কিশোর বয়সে যৌনতা সম্পর্কিত ধারণা হতে পারে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন।

কৈশোর যৌনচর্চার সূচনা

যৌনতা এবং যৌনচর্চা নিয়ে নানা ধরনের অভিমত প্রচলিত আছে। সেই সব অভিমতের বৈচিত্র্য, পার্থক্য এবং ব্যাপকতা এতই বেশি যে, সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা বড়দের পক্ষেই সহজ নয়। এমন একদিন ছিল, যখন 'যৌন' কথাটির দ্বারা শুধু মেয়েদের যোনি বোঝাত; কিন্তু আজ 'যৌন' বলতে ছেলেদেরও লিঙ্গ-বিষয়ক অনুভূতি এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝায়।

সাধারণ লোকের কাছে 'যৌন' চর্চা বললে সরাসরি যৌন সঙ্গম বোঝায়। ফ্রয়েডীয় মতবাদে, মানব-জীবনের সমস্ত সুখ-তৃপ্তি বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিই হল যৌনচর্চা। ব্রিটেনের ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ডঃ ব্রাউনের অভিমত হল–যে সব আচরণের মাধ্যমে মানুষ নিবিড়ভাবে দৈহিক সংস্পর্শে মিলিত হয়, তার মধ্যেই যৌনতার চর্চা ফুটে ওঠে। আমেরিকার যৌন-মনোবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড কিন্‌সী মনে করেন–যৌন অনুভূতি জাগায় এমন যে কোন ক্রিয়াকলাপ, এমন কি, যৌন-আবেদক ছবি দেখা, বা সেই ধরনের বই পড়া, তেমনি যৌন ভাবোদ্দীপক পোশাক পরাও যৌনচর্চার অন্তর্গত।

কৈশোরে যৌনচর্চার বিশ্লেষণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এসব অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে যে, কৈশোর পর্যায়ে বয়ঃসন্ধিকালের সময় থেকে পূর্ব বয়স্কতার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সময়ের মধ্যে মানুষের যৌন জীবনচর্চার যে প্রাথমিক অনুশীলন চলে, আমরা তা নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

কৈশোর পর্যায়ে যৌনচর্চা বলতে শুধুই যে যৌন সঙ্গম বুঝতে হবে, ত নয়। যৌনতা বিষয়ক আচরণ-চর্চাকে কিশোর বয়সে নানা রকম আচরণের পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, যার মধ্যে থাকে দিবাস্বপ্ন, কল্পনা, প্রবণতা এবং আরও নানা প্রকার অনুভূতি আর মনোভাব-সেগুলোর অভিপ্রকাশ এভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে।

১. যৌনাঙ্গের স্ফীতি
২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যৌন উত্তেজনা
৩. যৌন অনুভূতির উদ্রেক এবং চরম পুলক
৪. সন্তান সৃষ্টি।

স্বমেহনের কার্যকারণ

কিশোর বয়সে দিবাস্বপ্ন খুবই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং এ বয়সের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিশোর-কিশোরীদের দেহে-মনে যে সর্বাঙ্গীন পরিপক্কতা (ম্যাচুরিটি) জাগতে থাকে এবং তার ফলে যে সব নতুন নতুন আশা-আকাঙ্খা সৃষ্টি হতে থাকে, সেগুলো সব সময়ে বাস্তবক্ষেত্রে তৃপ্তি-ধন্য হতে পারে না। ফলে, কৈশোরে নানা রকম দিবাস্বপ্ন জাগে ছেলেমেয়েদের মনে–ঐ সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্খা মনে মনে পূর্ণ করতে চায় তারা।

কিশোর বয়সের দিবা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'ধরনের স্বপ্নালুতার খোঁজ পাওয়া যায়। এক ধরনের দিবাস্বপ্ন হল আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মগৌরবমূলক। এ ধরনের স্বপ্নের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা দেখতে চায়, তারা পড়াশুনায় কৃতিত্ব অর্জন করছে, খেলাধুলায় সব-সেরা হয়ে উঠছে, কিংবা কোনও দুঃসাহসিক কাজে জয়ী হয়ে আসছে।

আর এক ধরনের কৈশোর দিবাস্বপ্ন হল–প্রণয়মূলক। এসব স্বপ্নের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা তাদের আকাঙ্খিত বন্ধু বা বান্ধবীকে প্রণয়ী বা প্রণয়িনী রূপে দেখতে ভালবাসে, তাদের জয় করতেও চায়।

এসব দিবাস্বপ্ন চলতে ফিরতে, ঘরে নিরালায় বসে থেকেও আপন মনে দেখা যায় চোখ বন্ধ না করেও। এগুলো অধিকাংশই হয় তীব্র আবেগ আর প্রক্ষোভে সঞ্জীবিত এবং তারই ফলে কিশোর-কিশোরীদের মনে সাময়িকভাবে তৃপ্তি এনে দিতে পারে–যদিও সেটা অলীক স্বপ্ন মাত্র।

সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, এসব কৈশোর দিবাস্বপ্ন ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রফুল্ল রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে, তবে অতিরিক্ত এবং অবাস্তব দিবাস্বপ্ন চর্চা করলে তা সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী হয়ে উঠতেও পারে।

কিশোর বয়সের অন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল–সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা। এ বয়সে কিশোর-কিশোরীদের যৌন প্রক্রিয়াগুলো পরিণতি লাভ করে বলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সন্ধানে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ বয়সে কিশোর-কিশোরীদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুবই আগ্রহ বোধ করে এবং প্রণয়মূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে সহজেই মগ্ন হয়ে পড়ে।

যে সব সমাজে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অবাধ মেলামেলা অনুমোদিত নয়, সেই সব ক্ষেত্রে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের এ চাহিদাটি থাকে অপূর্ণ এবং তার ফলে যৌন চর্চার অস্বাভাবিক অভিপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে কাল্পনিক উত্তেজনা এবং বাস্তব জীবনে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অনুসন্ধানজনিত মানসিক প্রক্ষোভে আবেগের তীব্রতার ফলে কিশোর-কিশোরীদের সদ্য-উন্মেষিত যৌন সংবেদনশীলতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায় এবং তারই ফলে ছেলে মেয়ে উভয়েরই যৌন অঙ্গে, লিঙ্গে এবং ভগদেশে, উত্তেজনামূলক বিপুল রক্তসঞ্চার হয়। তারই পরিণামে তাদের যৌনাঙ্গ মাঝে মাঝেই স্ফীত হয়ে ওঠে এবং সর্বাঙ্গে পুলকমিশ্রিত শিহরণ বোধ হতে থাকে।

স্বভাবতই, যৌনাঙ্গে এ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হলে কিশোর-কিশোরী মাত্রই একান্ত নিরিবিলিতে তা স্পর্শ করে বুঝতে চায়, কেন এমন হচ্ছে, এবং উত্তেজিত স্ফীত যৌন অঙ্গে স্পর্শ করা মাত্র সেখানে আরও সংবেদনশীলতা জাগে--যার পরিণামে ছেলেমেয়েদের দেহে-মনে জাগে যৌন পুলক অনুভূতির মধুর বিচিত্র অস্বাদন। এ অনুভূতির মধ্যে যৌন সঙ্গমের কোনও চিন্তা কল্পনা প্রথমে বিন্দুমাত্র না থাকতেও পারে।

যৌনাঙ্গের ওপর এভাবে প্রত্যক্ষ পূলক অনুভূতিমূলক মনোযোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বলেই তারা যৌনাঙ্গ নিয়ে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে এবং সেই পুলক অনুভূতিকে দীর্ঘস্থায়ী আর তীব্রতর করতে চায়। এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক দু'রকমেরই হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবে কিশোর-কিশোরীরা যখন তাদের উত্তেজিত স্ফীত যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তখন সেই আঙ্গিক আচরণের মধ্যে থাকে কোমলতা, সংবেদনশীলতা এবং মমতাবোধ। ছেলেরা তাদের স্ফীত লিঙ্গটিকে হাতের মধ্যে চেপে ধরে ধীরে ধীরে নাড়াতে থাকে, লিঙ্গ মূলে মৃদু স্পর্শ করে এবং তার ফলে শিহরণ বৃদ্ধি পেলে চরম পুলক লাভ করে। এ চরম পুলক লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রভাবে ছেলেদের বীর্যরসও নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

মেয়েরা তাদের যৌনিপক্ষীতিজনিত পুলক অনুভূতি তীব্রতর করে তোলার উদ্দেশ্যে মৃদুস্পর্শ দিয়ে শিহরণ সৃষ্টি করতে চায় এবং সেই প্রক্রিয়ার সময়ে যখন তারা তাদের অতি সংবেদশীল ভগাঙ্কুর স্পর্শ করে, তখন বুঝতে পারে, ঐ ছোট্ট স্নায়ুগুচ্ছটি বিশেষভাবে পুলক সৃষ্টি করে।

স্বভাবতই, এ আবিস্কারের ফলে কিশোরী মেয়ে মাত্রেরই ঐ ভগাঙ্কুর স্পর্শ এবং ওপর-নিচে আঙুল চালিয়ে মৃদু ঘর্ষণ করে পুলক সৃষ্টি করার খুবই ইচ্ছা হয়। উল্লেখযোগ্য এ যে, ঐ প্রচেষ্টা থেকেই জাগে তার দেহে চরম পুলক এবং যোনিপথে পিচ্ছিল রসক্ষরণ।

বিশেষ করে, মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব যে ক'দিন হয়, যোনিপথের মাধ্যমে রক্ত নির্গমনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, তার ঠিক পরেই বেশ অদম্য এক ধরনের শিহরণ বা মৃদু শির্ শির্ ভাব মেয়েরা অনেকেই বোধ করে। সেই শিহরণ প্রশমনের জন্যেই মেয়েরা মাসিক স্রাবের পরেই সচরাচর স্বমেহন চর্চায় অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়।

কিশোর-কিশোরীদের যৌনচর্চার সূচনা হয় স্বভাবত এ ধরনের সহজাত আবিষ্কার প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক আহ্বানে। এ আবিষ্মাদনা তাদের জীবনে নিয়ে আসে এক দুর্বার আত্মনির্ভরশীলতা আর আত্মমর্যাদার মনোভাব-তার স্বাধীন সত্তাবোধের নব পর্যায়। এর মধ্যে থাকে না কিছুমাত্র অপরাধবোধ। নিজেকে আবিস্কারের মধ্যে অপরাধবোধ থাকতেই পারে না। প্রায় একই বয়সের পর্যায়ে কিশোর এবং কিশোরী উভয়েই প্রকৃতির পাঠশালায় এভাবে যৌনচর্চার হাতেখড়ি নেয়।

যৌনচর্চার এ প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় হস্তমৈথুন বা স্বমেহন। ছেলেমেয়েরা কৈশোর পর্যায়ে সকলেই সঠিক সময়ে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে প্রকৃতির নির্দেশে। সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবেই তাদের নিজস্ব একান্ত গোপনীয় অভিজ্ঞতা হয়ে তাকে–মা-বাবা অভিভাবক শিক্ষক কাউকেই সেই অতুলনীয় অভিজ্ঞতা সম্পদের খবর জানাতে চায় না।

স্বমেহন প্রকৃতপক্ষে তখনই বেশি ক্ষতি করে, যখন তার সঙ্গে একটা অন্যায়বোধ বা পাপবোধ জড়ানো থাকে। ছোটদের স্বমেহন করতে নিশ্চয়ই আমরা উৎসাহ দেব না, কিন্তু বারণও করব না। কারণ, তাদের আবিষ্কারের উপলব্ধি ব্যাহত হলে বিরক্তি এবং বিদ্রোহ জাগবার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, যৌনতার পেছনে থাকে প্রচন্ড আত্মিক প্রাণশক্তির ঐশ্বরিক শুভ প্রেরণা। সেই প্রেরণার সার্থক রূপায়নে বড়দের কোনও রকম সহযোগিতা করা যতদিন না সম্ভব হচ্ছে, ততদিন স্বমেহন চর্চার মাধ্যমেই সেই শক্তিকে সংহত রাখবার প্রাকৃতিক প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া একান্তই অসঙ্গত এবং অসমীচীন।

স্বাস্থ্যের নীতির দিক থেকে বলতে গেলে, স্বমেহনের ফলে ছেলেদের বীর্যপাত হলে ভয় পাবার কিছু নেই–এটাই শারীরবিজ্ঞানীদের আশ্বাস। তাঁরা বলেন, বীর্যক্ষয় হলেই শরীর দুর্বল হয়ে উৎকট ব্যাধি জন্মায়, এ কথা পুরোপুরি সত্য নয়।

তবে একটা কথা ঠিক, জীবনের যে কোন কাজেই খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। আবার, একজনের কাছে যেটা বাড়াবাড়ি, অন্যজনের কাছে সেটা তেমন কিছুই নয়।

যে পরিমাণে দেহের মধ্যে বীর্য সৃষ্টি হচ্ছে, ছেলেরা সেই অনুপাতে হস্তমেহন করলে ক্ষতি হতে পারে না। তবে, একেবারে ক্রান্তির শেষ পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কে কতবার স্বমেহন করলে ক্ষতি হবে না, তা ঠিক বলা যায় না। কারুর পক্ষে দিনে একবারই যথেষ্ট, কারুর পক্ষে সপ্তাহে একবার স্বমেহন করলেই খুব বেশি হয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে কিশোর-কিশোরীদের যৌন আচরণ সম্পর্কে চেসার রিপোর্ট, নামে যে যুগান্তকারী তদন্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল বিগত ষাটের দশকে, সেই বিবরণীর প্রণেতা ডাঃ অসটেস চেসার তাই বলেছিলেন, প্রত্যেকের নিজের নিজের যৌন প্রয়োজন অনুসারে যতখানি স্বমেহন করা যায়, তার বেশি কেউ করে না, করতে ভাল লাগে না, করতেও পারে না। কারণ, যখনই অতিরিক্ত অবসন্নতা আসবে, তখনই স্বমেহনের ইচ্ছা আর থাকবে না।

বীর্য কতখানি করে দেহের মধ্যে উৎপত্তি হচ্ছে, তার অনুপাতে অবশ্য যৌন অনুভূতির মাপকাঠি নির্ধারণ করা চলে না, কারণ যৌন প্রবৃত্তি হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের একটা অদম্য বাসনা। স্বমেহনের মাধ্যমে সেই-বাসনা তৃপ্তি পায় না বলে অনেকে একে 'গোপন পাপ' কিংবা 'আত্মপীড়ন' এসব বলেও থাকেন। এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে একটা কথা মানতেই হবে যে, স্বমেহন করলে তৃপ্তি পাওয়া যায়, যদিও সেই তৃপ্তি যৌন সঙ্গমের সম্যক তৃপ্তির চেয়ে পৃথক ধরনের বিকল্প মাত্র।

এ-যেন ঠিক একজন বক্তা ফাঁকা ঘরে বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে তৈরি করছে। খুবই স্বাভাবিক এ প্রস্তুতি চর্চা, কিন্তু সেটাই শেষ নয়। এ অভ্যাসের প্রস্তুতি অতিক্রম করে কিশোর-বয়সী ছেলেরা যাতে বয়স্ক জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন হতে শেখে তার প্রেরণা লাভের উপযোগী সংযমী মনোভাব তাদের মধ্যে জাগানো যেতে পারে কিনা, তা বড়দেরই ভাবতে হবে।

কোন কোন আদিবাসী সমাজে ছেলেদের যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগবার বয়স হলেই তাদের ইচ্ছামতো পছন্দ অনুযায়ী মেয়েদের সঙ্গে অবাধে যৌন সঙ্গমের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে সেটা খুবই অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আমাদের সভ্য সমাজে স্বমেহন বা হস্ত মৈথুনের অভ্যাসটিকে স্বাস্থ্য সম্মত বিকল্প যৌন অভিজ্ঞতার চর্চা বলে কিছুটা মেনে নিতে পারা যায় বলেই ডাঃ চেসার পরামর্শ দিয়েছেন।

এ অভ্যাস-অনুশীলনের হাতেখড়ি যে প্রকৃতি যেন নিজে থেকেই ছেলেদের দিয়ে দেন যথাসময়ে, এজন্যে আমাদের উচিত সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব মঙ্গলময় বিধিব্যবস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

এভাবে যৌন আকাঙ্ক্ষার শক্তিকে মুক্তি দেবার পথ জানা না থাকলে ছেলেদের অনেক স্নায়বিক কষ্ট পেতে হত বলেই শারীরবিজ্ঞানীদের ধারণা। তবে, কে কতবার হস্তমেহন করতে পারে, সেটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। কেবল যৌন অনুভূতি ছাড়া আরও অনেক কিছু সেখানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মেয়েরা হস্তমেহন করলে মায়েরা অতটা ব্যস্ত হন না। হয়তো এর কারণ এ যে, মেয়েরা খুব কমই এটা করে, তাই অতটা দোষের মনে করা হয় না। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে একটা মস্ত বড় তফাৎ এখানে।

এ পার্থক্যটা ভালভাবে বুঝতে না পারলে ছেলে আর মেয়েরা পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না। দু'জনের যৌন অঙ্গের গড়নের মধ্যে একগভীর তাৎপর্যপূর্ণ দৈহিক পার্থক্য রয়েছে–দুটির উদ্দেশ্যও দু'রকম।

প্রাকৃতিক জৈব নিয়মে, পুরুষাঙ্গের কাজ হল নারীর যোনিপথে প্রাণের বীজ রোপন করে দেওয়া আর সন্তান সৃষ্টির মহান সূচনা করা। ছেলেদের দেহে-মনে চরম পুলক তৃপ্তি জাগে যখন বীর্যপাত ঘটে সেই মুহূর্তটিতে–সেটা স্বমেহন করেই হোক, কিংবা যৌন সঙ্গম করেই হোক। সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষের কাজ ঐখানেই শেষ। তার আর কিছু করার থাকে না।

কোনও মেয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা এর সঙ্গে কোনভাবেই তুলনা করা চলে না। সে-ও যৌন অনুভূতির উত্তেজনা এবং চরম পুলকের মধুর অভিজ্ঞতা-আস্বাদন লাভ করতে পারে, কিন্তু যে-বীর্যরস কোনও ছেলের লিঙ্গ মাধ্যমে তার দেহের মধ্যে যোনিপথ দিয়ে সে গ্রহণ করে, ঐ রকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রাণ শক্তির রস যৌন-অভ্যাসের ফলে কোনক্রমেই তার দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় না।

অবশ্য যৌন উত্তেজনার সময়ে প্রচুর পরিমাণে পিচ্ছিল গ্রন্থিরসক্ষরণ হতে থাকে মেয়েদের যোনিপথে। তা ছাড়া চরম পুলক লাভের জন্যে পৃথক চেষ্টায় যোনিপথকে উত্তেজিত করারও প্রয়োজন হয় না তাদের। কারণ মেয়েদের দেহের অন্যান্য কয়েকটি অংশ বিশেষভাবে যৌন সংবেদনশীল।

সবচেয়ে বেশি স্পর্শচেতন হল মেয়েদের যোনিমুখের ওপরে ছোট ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটরিস অংশটি–এমন স্পশচেতন আর কোন অংশ নয়। কোনও মেয়ে যদি হস্তমেহন করে, তা হলে তার যোনিপথ নিয়ে খেলা করার চেয়ে ভগাঙ্কুর নিয়ে আদর করতেই সে বেশি ভালবাসবে।

হয় তো এ জন্যেই অনেক মেয়েই ছেলেদের মতো যৌন সঙ্গমের জন্যে অতটা ব্যস্ত হয় না। অবশ্য, মেয়েদের যৌনসঙ্গমের প্রতি অনিচ্ছা এবং দ্বিধার আরও অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হল সন্তান সম্ভাবনার ঝুঁকি।

মেয়েকে স্বমেহন করতে দেখলে মা-বাবা খুব চঞ্চল হন না। তাঁদের বেশি দুশ্চিন্তা হয় মেয়ে যেন সন্তানসম্ভবা হয়ে না পড়ে। তাই মেয়ে স্বমেহনে প্রবৃত্ত হচ্ছে জানতে পারলেও তাঁরা সাধারণত কিছু বলেন না, কারণ হয় তো মনে করেন স্বমেহন করে মেয়ে নিজেকে তৃপ্ত রাখতে পারলে ছেলেদের দিকে বেশি আকৃষ্ট না হতেও পারে।

মেয়েরা যত বড় হতে থাকে, নারী হয়ে উঠতে চায়। আর-পাঁচটি মেয়েদের মতো ঠোঁটে রঙ লাগায়, বুকে পাছায় ভালভাবে কাপড় জড়ায়। তাদের নিজেদের বক্ষ ও নিতম্বের মনোহর বঙ্কিম তরঙ্গরেখা তাদের ভাল লাগে, আর সেটা সকলকে দেখিয়ে গর্ব অনুভব করতেও চায়। যত বাধাই আসুক, যত সংরক্ষণশীলতার গন্ডি দেওয়াই থাকুক, সব কিছু ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে, মেয়েরা তখন ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বর্ণনাতীতভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এক রোমাঞ্চকর নব্য সমাজায়নের দুর্বার অভিযান সূচিত হয় তখন তাদের জীবনে।

এ সময়ে মেয়েদের গতানুগতিক বিধিনিষেধের পরামর্শ দিলে নানাভাবে অশান্তি জাগে। যৌনচর্চার বিপজ্জনক পরিণতি এবং ছেলেদের স্বভাব নোংরা বলে তাদের মনে যেসব ধারণা গড়ে তোলা হয়, তার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পথে যৌন আকাঙ্খা প্রকাশের আনন্দ ম্লান হয়ে তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী বিষন্নতার সৃষ্টি হতে পারে কিংবা এসব সতর্কতামূলক উপদেশ পরামর্শ এতই অস্পষ্ট হতে পারে, যার ফলে মেয়েরা হয় তো বুঝতেই পারে না আসল ব্যাপারটি কি।

যৌন-মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হ্যাভলক এলিস তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছিলেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ ছেলেমেয়েই-মাঝে মাঝে স্বমেহন করে থাকে, আর বাকি ১ শতাংশ সম্ভবত সত্য গোপন করে। কৈশোর পর্যায়ে যৌনচর্চার সূচনা হয়ে থাকে মূলত এ স্বমেহন অভ্যাসের মাধ্যমেই।

এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমেরিকার প্রখ্যাত যৌন-মনোবিজ্ঞানী ডঃ অ্যালফ্রেড কিন্‌সী তাঁর চাঞ্চল্যকের বিপুল গবেষণালব্ধ তথ্যসম্ভারে বিশ্ববাসীকে সচকিত করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বমেহন চর্চা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রায় সর্বত্র সকলেই অনুশীলন করে থাকে। কিন্‌সী রিপোর্টে বলা হয়েছিল, কৈশোর এবং তারুণ্যের পর্যায়ে ৯২ শতাংশ ছেলেমেয়ের জীবন-বিকাশের অপরিহার্য অনুশীলন-চর্চা এ হস্তমেহন।

কিন্‌সী তাঁর তথ্য-বিবরণীতে দেখিয়েছিলেন, ছেলেরা ১০ বছর বয়সেই স্বমেহন জনিত পুলক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তাঁর সমসাময়িক অন্য এক গবেষক র‍্যামসী-ও লক্ষ্য করেছিলেন, কিশোর বয়সে নিয়মিতভাবে যৌনচর্চার যে সূচনা হয়, তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা পর্ব ১০ বছর বয়সেই ছেলেদের জীবনে ঘটে যায় এবং সেই চর্চা পরিণত কৈশোর জীবনধারায় ২০-২১ বছর বয়স পর্যন্তও চলতে পারে। এ পর্যায়ে প্রায় ৮৮ শতাংশ ছেলেরাই সপ্তাহে একবার থেকে চারবার পর্যন্তও স্বমেহন পুলক লাভে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

কৈশোর এবং তারুণ্যের পরিণত পর্যায় যতই এগিয়ে আসতে থাকে, স্বমেহন চর্চা ততই বাড়তে থাকে। বিশেষ করে, নিম্ন-ম্যধবিত্ত-পরিবারের ছেলেদের মধ্যেই এ প্রবণতা বেশি করে লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের পরিবেশে স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা কিংবা আগ্রহ অনুরাগ থাকে খুব কম। কিন্তু কৈশোর এবং তারুণ্যের পরিণত পর্যায়ে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে, শিক্ষিত পরিবেশেও ছেলেদের মধ্যে স্বমেহন চর্চা বেড়ে যায়।

কিন্‌সী তাঁর ব্যাপক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের উপসংহারে কৌতূহলোদ্দীপক এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন যে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার পরিবেশে যে-সব ছেলে বাস করে, তাদের মধ্যে যদি 'উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উচ্চাকাঙ্খা' থাকে, তা হলে কৈশোর পর্যায় পরিণত হওয়ার নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা যারা স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়, তাদের মধ্যে স্বমেহন চর্চা কম থাকে।

এ রহস্য বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চাকাঙ্খার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই কিশোর বয়সী ছেলেদের দেহ-মনে যে-অস্থিরতা এনে দেয়, তার উপশমের জন্যেই প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বমেহন চর্চা করে উচ্চাকাঙ্খী ছেলেরা মানসিক টানাপোড়েন খানিকটা লাঘব করে ফেলতে চায় সহজাত প্রবৃত্তিবশে।

সুতরাং এ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হল এ যে, সব রকম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, মানসিক টানাপোড়েন অর্থাৎ কাজকর্ম, খেলাধূলা, পড়াশুনার অসম প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানের অহরহ উৎপীড়ন থেকে ছেলেমেয়েদের মুক্ত, প্রফুল্ল আর স্বচ্ছন্দ রাখতে পারলে তারা স্বমেহন চর্চার অভ্যাস কমাতে পারে।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনধারা মেনে চলার উপযোগী বিধি পালনের ব্যবস্থা এ জন্যেই প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক যুগে। রাজার ছেলেও ব্রহ্মচর্য আশ্রমের জীবনধারার মাধ্যমে সংযত হতে শেখানো হত। এখনও ছেলেমেয়েদের জন্য ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ধারায় বিধিবদ্ধ জীবনযাপনের রীতি এদেশে বিদেশে কোনও কোনও সনাতন পদ্ধতির আদর্শঅনুসারী সংস্থা-প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আছে এবং সমাজ-স্বাস্থ্যের অনুকূল সেই গুরুকূল শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে পুনরুজ্জীবনের জন্যও কোনও কোন সমাজ-সংস্কারক উদ্যোগীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

ব্রহ্মচর্য মতে বিধিবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে ওঠা, উন্মুক্ত জায়গায় দু'বেলা স্নান, যোগাসন অভ্যাস, ভগবৎ ভজনা, মনীষী চর্চা, সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার, উত্তেজক আহারাদি, যেমন ঝাল, মশলা, পিঁয়াজ, রসুন এবং তেল, ঘী কমানো, চা, কফি ইত্যাদি উত্তেজক পানীয় বর্জন, দুধ, দই, ঘোল, লেবুর রস, চিনি মৌরীর জল ইত্যাদি স্নিগ্ধ পানীয় নিয়মিতভাবে যথেষ্ট গ্রহণ করার অভ্যাস ইত্যাদি।

ব্যায়াম ও খেলাধূলার মধ্যেও বিষম উত্তেজক ব্যায়ামচর্চা ও খেলাগুলো অবশ্যই বাদ দেওয়া ভাল। যে সব ব্যায়ামে ও খেলায় নির্মল আনন্দ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জিত প্রফুল্ল পরিবেশ রচিত হয়, কেবলমাত্র সেই ধরনের ব্যায়ামচর্চা ও খেলাধূলার দিকেই ছেলেমেয়েদের যতবেশি সম্ভব আগ্রহী করে তোলা উচিত।

ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও যথাসম্ভব হালকা সাদাসিধে ধরনের হওয়া দরকার। মেয়েদের আঁটসাঁট পোশাক, এমন কি জীন্‌স্ বা ঐ ধরনের মোটা কাপড়ের জাঙিয়া, সালোয়ার, প্যান্ট পরাও যুক্তিযুক্ত নয়। ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গের অন্তর্বাস সর্বাদাই নরম কাপড়ের তৈরি হওয়া উচিত। ছেলেদের কৌপীন বা ল্যাঙ্গট পরার অভ্যাস যৌনসংযমের পক্ষে যেমন বেশ সহায়ক, তেমনি তাদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতাবিশিষ্ট গতি-প্রকৃতির পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধাজনক স্বাচ্ছন্দ্যময় ও স্বাস্থ্যসম্মত বলে শারীর-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য যৌনশিক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই বড়দের উচিত তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, নিছক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লোভ-তাড়নায় যখন তখন স্বমেহন-চর্চা করলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই বিবাহিত জীবনে যৌন দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে। সেই দুর্বলতা হল–যৌনসঙ্গমের সময়ে চরম পুলক সৃষ্টির আগেই ছেলেদের বীর্যপাতে বেগ ধারণে অক্ষমতা জাগে এবং অতিরিক্ত স্বমেহনে অভ্যস্ত মেয়েদেরও যথাসময়ে চরম পুলক সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিদারুণ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং অশান্তি জেগে ওঠে।

নারী-পুরুষের যৌনরতিসুখের আদর্শ হল এ যে, সঙ্গমকালে যথাসময়ে একই সঙ্গে পুরুষের বীর্যপাত এবং নারীর চরম পুলক শিহরণ জাগবে। যে সব দম্পতির ক্ষেত্রে এ আদর্শ অভিজ্ঞতা-সুখ অর্জন করা সম্ভব হয় না, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নিরীক্ষায় দেখা গেছে সেই সব দম্পতিরা কৈশোরে অতিরিক্ত স্বমেহন চর্চা করতেন এবং তার ফলে তাঁদের চরম পুলকের বেগ ধারণের ক্ষমতা কমে যায়। এ জন্যেই বয়স্ক জীবনের যৌনরতিসুখের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করতে হলে অতিরিক্ত স্বমেহনচর্চা পরিহার করতে হবে, এ কথা কিশোর-কিশোরীদের বলা চাই।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্বমেহনর্চ্চায় অভ্যস্ত মানুষকে খানিকটা কুব্জতা-পীড়িত হতেও দেখা গেছে, অর্থাৎ তাঁরা সামনের দিকে ঝুঁকে চলেন। নিয়মিত স্বমেহনচর্চার মাধ্যমে যে অবসাদ-তৃপ্তি জাগে, তারই ফলে দেহসৌষ্ঠ এ ধরনের বিকৃত প্রতিফলন ফুটে ওঠে বলেই মনে হয়। সুতরাং সেই বিবেচনাতেও অতিরিক্ত স্বমেহনচর্চার কুফল সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের যথাসময়ে সতর্ক করে দেওয়া ভাল।

কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণবোধ

কিশোর বয়সের জীবন-বিকাশের ধারায় নব নব চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। সেই সব বিচিত্র চেতনার অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় কিশোর-কিশোরীদের দৈনন্দিন আচরণে। তারা ক্রমে নিজেদের এক একজন কিশোর এবং কিশোরীরূপে পৃথক ব্যক্তিসত্তার আত্মমর্যাদায় ভাবতে শেখে। সেই নতুন আনন্দময় সত্তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা পরস্পরের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়, দল বাঁধে, নিজেদের ভাবনা-চিন্তা, রকমারি সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে আলোচনা চক্র গড়ে তোলে।

এ দল বাঁধা প্রবৃত্তি তাদের পরস্পরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে বলেই সকল সকলকে ভালভাবে জানতে চায়, চিনতে, বুঝতে চায়। এভাবেই রকমারি স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তারা পরিচিত হতে থাকে এবং নিজেদের বৈচিত্র্য আরও প্রসারিত করবার সুযোগ পেতে চায়। পরস্পরের যৌনতার প্রতি কৌতূহল তখন তাদের থাকে না বললেই চলে।

তবে, পরিণত কিশোর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে বলে পৃথক হয়ে থাকার প্রবণতা বেশ বেড়ে চলে। ছেলেরা আর মেয়েরা পরস্পরের বেশভূষা আচার-আচরণ কথাবার্তায় স্পষ্টই আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও সংস্কোচ বশে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রেখেই চলতে চায়।

তার মানে এ নয় যে, ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের এড়িয়ে চলতে চায়। তাদের মানসিকতায় ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়াই অদম্য হয়ে জেগে থাকে। সুন্দর হয়ে থাকা, সুন্দর সাজগোজ করা, সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা–এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে কিশোর এবং কিশোরী উভয়েই যেন নানাভাবে পরস্পরকে কাছেই পেতে চায়। কাছে এলেই শত দুঃখ বেদনা বিরক্তির মাঝেও প্রফুল্ল হাসিতে মুখটি ঝলমল করে ওঠে উভয়েরই। সেই হাসিতে থাকে লজ্জা সঙ্কোচ অপ্রতিভতা অথচ সানন্দ কৃতজ্ঞতা বোধের সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ।

এ আকর্ষণের মূলে থাকে তাদের দেহ-সৌষ্ঠবের অপূর্ব বিকাশ। কিশোর বয়সী ছেলেরা যেমন তাদের নিজেদের শারীরিক বিকাশ পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়, তেমনি তারা কিশোরী মেয়েদের দেহ-লাবণ্যেও আকৃষ্ট হয়। আর কিশোরী মেয়েরাও তাদের নিজেদের দেহের বিস্ময়কর বিবর্তন লক্ষণগুলো দেখে যেমন চমৎকৃত হয়ে থাকে, তেমনি দ্বিগুণ উৎফুল্লতা অনুভব করে তাদের সমবয়সী ছেলের দেহের নবোন্মোসিত তারুণ্যের প্রভা লক্ষ্য করে–সেদিকে তারা বারে বারে চোখ ফিরিয়ে দেখতে চায়, মন দিয়ে ভাবতে ভালবাসে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এ মধুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য। যে-সব শিশু একদিন মিলে মিশে স্বচ্ছন্দে হুটোপাটি খেলাধুলা করত ছেলে বা মেয়ে না ভেবে, কিশোর পর্যায়ে উপনীত হয়ে তারাই আলাদাভাবে দল গড়তে চায়, আবার ফিরে ফিরে কাছাকাছি হতেও চায়।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্যেই এ ধরনের আপাত বিপরীতধর্মী পার্থক্য বোধ এবং আকর্ষণ স্পৃহার মানসিকতা একই সাথে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পার্থক্য বোধের জন্যেই আকর্ষণ স্পৃহার তীব্রতা স্বভাবতই অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

খুব কাছাকাছি যদি ছেলেরা এবং মেয়েরা সর্বক্ষণ থাকে, তা হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ স্পৃহার মনোহারিত্ব অবশ্যই কমে যেতে থাকবে ক্রমেই পরিচিত সহজ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই।

সে কারণেই প্রকৃতির সুষ্ঠু নিয়ম অনুসারে ছেলেরা আর মেয়েরা কিশোর বয়সে প্রথম দিকে আলাদা থাকতেই ভালবাসে। প্রথম পর্যায়ে দূরে দূরে থাকতে হয় বলেই পরবর্তী পর্যায়ে কাছে আসার টান বাড়তে থাকে। মানব সমাজ-প্রকৃতিও তাই কৈশোরের প্রথম পর্যায়ে ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান রেখে চলতে শেখায় সম্ভবত জৈব-প্রকৃতির এ রহস্য-নির্দেশেই।

এভাবে বিশ্লেষণের ফলে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, জৈব প্রকৃতি এবং সমাজ প্রকৃতি এক সম্মিলিত সহযোগে বয়ঃপ্রাপ্তির ঠিক আগেই কৈশোর বিকাশধারার মাধ্যমে ছেলেদের এবং মেয়েদের মধ্যে আকর্ষণবোধ যথার্থভাবেই প্রতিরোধ্য করে তোলে।

বড়রা সহানুভূতি দিয়ে ভাবলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, প্রকৃতির এ সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে কিশোর-কিশোরীদের আকর্ষণবোধের মাঝে কোনও রকম প্রাচীর তুলতে গেলে ফল ভাল হতে পারে না কোন মতেই, বিশেষত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা এ কারণেই এ সম্পর্কে প্রয়োজনভিত্তিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বলেছেন, জীবন-বিকাশের সকল পর্যায়ে মানুষ যখনই যা কিছু করে, তা সবই কোনও না কোনও সুস্থ প্রাকৃতিক তাগিদ মেটাতেই করে। কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণবোধের পেছনেও আছে তেমনি অদম্য এক তাগিদ, জীবন-বিকাশের এক আশু প্রয়োজন, তা হল—পরস্পরের পরিপূর্ণতার পথে যেখানে যতটুকু জ্ঞান এবং তথ্যের ঘাটতি আছে, তার পরিপূরক স্বরূপ অভিজ্ঞতার বিনিময়।

এ যে পরিপূরক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের তাগিদ, এরই জন্য আবার কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আকর্ষণের বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করাও যায়। যার দিকে প্রথমে আকৃষ্ট হয়, তার কাছে প্রয়োজনের উপযোগী অভিজ্ঞতা সম্পদ যথাযথভাবে না থাকলে, ছেলেমেয়েরা আকর্ষণ হারায় স্বাভাবিক-ভাবেই।

প্রথম দিকে এ আকর্ষণবোধের ভিত্তি হয় পড়াশুনা খেলাধূলা। তারপরে ক্রমশ সাজপোশাক, খাবার-দাবার, আমোদ-প্রমোদের জগতে কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণের পরিমন্ডল বেশ ব্যাপ্ত হতে থাকে।

এসব পর্যায় অতিক্রম করার সময়ে কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করে এবং ঐ ধরনের সান্নিধ্যের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক যৌনতার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কেও সচেতনতা এবং কৌতূহল জাগতে থাকে। আকস্মিক মৃদু অঙ্গ স্পর্শের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে শিহরণ পুলক জাগে, পাশাপাশি বসলে বিচিত্র এক রোমাঞ্চ অনুভব হয়। এমনি আকস্মিক পরিবেশ থেকেই তাদের আকর্ষণবোধের মোহময় তীব্রতা লাভ করতে থাকে। রোমাঞ্চ-শিহরণ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার পূনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্যই পারস্পরিক সান্নিধ্য তারা বারে বারে পেতে চায়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আকর্ষণবোধের অন্তত দুটি প্রধান দিক আছে, একটি হল–অভিজ্ঞতা বিনিময়, আর অন্যটি হল–রোমাঞ্চ অনুভব। এ দু'ধরনের আকর্ষণবোধের মাধ্যমেই তারা যৌনতাবোধের অনুশীলন চর্চায়ও দীক্ষিত হতে থাকে সহজাতভাবে।

অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সাহায্যে যৌনতা সম্পর্কিত শারীরিক রহস্যগুলো এবং মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোর যথাসম্ভব পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। আর রোমাঞ্চ অনুভবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বুঝতে শেখে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণবোধ অবশ্যই একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবন-বিকাশ পর্যায়।

এ ধরনের আকর্ষণবোধ জনিত বিচিত্র অনুভূতি-সম্পদ সবই হল কিশোর-কিশোরীদের আসন্ন বয়স্ক জীবনের আসন্ন নব পর্যায়ের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ অনুশীলনীর পরম পাথেয়। তাই, এসব অনুভূতি মোটেই ছেলেমানুষী আবেগ প্রক্ষোভ নয়। সে কথা মনে রেখেই ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক আকর্ষণবোধের সংযত চর্চার এবং শালীনতার যথাযথ পথনির্দেশ দেওয়া উচিত।

সেই পথনির্দেশ হবে না নেতিবাচক। ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি সমীহভাব এবং সম্ভ্রমবোধ অনুশীলনের পরামর্শ দিয়ে তার উপযোগী সমাজ পরিবেশ রচনা করেও দিতে হবে। বড় হয়ে ওঠার মর্যাদাসম্পন্ন আচরণ শেখার এ তো সময়। মা বাবা 'আপনি আচরি ধর্ম এ পথের বাস্তব নিশানা দেখাবেন বন্ধুর মতো।

কৈশোরে প্রেম, ভালবাসা ও বিবাহ-ধারণার গুরুত্ব

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যে সব দৈহিক পরিবর্তন ঘটে সেগুলোর ফলে তাদের মধ্যে কিশোর বা কিশোরী রূপে সুস্পষ্টভাবে কতগুলো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, শুধু তাই নয়–ঐ পরিবর্তনগুলোর ফলে যৌনতা বোধেরও পরিবর্তন আসে, এমন কি মা বাবা অভিভাবক বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও তাদের ধারণা বদলাতে থাকে, বিশেষ করে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের মান বদলে যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে এবং মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং যোগাযোগ সম্পর্কের নতুন জগতে প্রবেশ করে। প্রথম পর্যায়ে এ অনুশীলন চর্চায় তারা প্রায়ই বেশ অপ্রতিভ অবস্থায় থাকে, নিজেদের নিরাপত্তা বিষয়ে হয়ে থাকে বিশেষভাবে সন্দিহান; সমাজ পরিবেশে কোথায় কেমন তাদের নিন্দা মন্দ হবে, তাই নিয়ে অহরহ নানা–কিশোর-কিশোরীরা উভয়েই, ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের ভাল লাগার প্রথম আগ্রহের উন্মেষ ঘটলে বুঝতে পারে, সেই আগ্রহের সঙ্গে যৌনতার কোথাও যেন একটা সংযোগ-সুত্র আছে।

এ যে যৌনতার অস্পষ্ট উপলব্ধি ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে জাগে তার প্রকৃত তাৎপর্য কিন্তু তারা তখনও ভালভাবে বোঝে না। তবে, সে ধরনের অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা যে সব আচার-আচরণ কথা বার্তায় রত হতে থাকে, সেগুলোর ভাল-মন্দ বিচার এবং নৈতিক বিশ্লেষণের প্রশ্নও তাদের মনে জাগতে থাকে।

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক এবং তারই ফলে মা-বাবার কাছ থেকেও ব্যবধান রেখে চলতে চায়। এরই ফলে কিশোর-কিশোরীরা খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ যে করে না, তা নয়। বিশেষ করে, ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গে যে ধরনের ভালবাসার অভিব্যক্তি তার জীবনে ঘটে থাকত, সেগুলোর কথা ভাবলে কিশোর-কিশোরীরা তাদের নব চেতনার উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা অস্বাভাবিকতার অনুভূতি উপলব্ধি করে।

যাই হোক, ইতিমধ্যে কৈশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা তাদের দৈহিক বিকাশের যতটুকু পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং যতখানি অভিজ্ঞতা সম্পদ সঞ্চয় করতে পেরেছে, তাকেই পাথেয় করে নিয়ে তার যৌনতা বোধ এবং নতুন সামাজিক বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ভালবাসার দক্ষতা প্রয়োগের অভিযানে বেরিয়ে পড়তেই চায়।

এ অভিযানেই কিশোর জীবনবিকাশ পর্যায়ের সবটাই কেটে যায় এবং বয়স্ক জীবনধারার খানিকটাও তাতে নিয়োজিত হয়, যার মাধ্যমেই ছেলেমেয়েরা তাদের যৌনতাবোধের যথাযোগ্য অনুভূতি সাধনের সক্ষমতা লাভ করে। বুঝতে পারে, কী বিপুল দায়িত্বসমন্বিত নতুন মর্যাদাসম্পদে অধিকারী তারা হয়ে উঠেছে।

মানুষ যতই পরিপূর্ণতা এবং পরিপক্কতা অর্জন করতে থাকে, তার প্রয়োজনের তাগিদ আর অভাব-অভিযোগের স্বরূপও ক্রমশ ততই জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার সময়ে সকলেই চায় আরও ভালবাসা; শুধু তাই নয়, চায় তাকে সবাই মেনে নেবে, মর্যাদা দেবে, আর চায় কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে, কোনও লক্ষ্য সামনে রেখে বড় হয়ে উঠতে।

এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা আর জীবনের তাগিদ-প্রয়োজন যে পরিমাণে মিটতে থাকে, সে অনুপাতেই কিশোর-কিশোরীদের আবেগ-প্রক্ষোভের পরিণতি পরিপক্কতাও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হতে থাকে। কৈশোর পর্যায়ের আচরণ অভিব্যক্তি অনেক সময়েই বড়দের কাছে নিতান্তই খেয়াল-খুশির মতো মনে হয়। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের আচরণে যে চঞ্চল, দুর্দান্ত, অসংবদ্ধ অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে, সে সবই সৃষ্টি হয় বয়ঃসন্ধিকালের বিপুল পরিবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে অর্জিত আকস্মিক শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধির পরিণামেই।

সেই শক্তিপুঞ্জ থেকে বিকীর্ণ অপ্রতিরোধ্য আবেগরাশিকে মুক্তি দেবার প্রচন্ড তাগিদেই কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছ যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাধারা প্রায়ই বেশ খানিকটা পরাভূত এবং অবদমিত হয়ে যায়। এ কারণেই কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রেই ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অবসর না পেয়েই কোন কিছু করে ফেলার হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে পড়ে।

এ বয়সে কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে তাদের মা-বাবার বিরোধিতা করার তাগিদ উপলব্ধি করতে থাকে। এ তাগিদ মেটাতে পারলে তারা স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যবোধে দীক্ষিত হতে পারে এবং সহজ প্রফুল্লতার মাধ্যমে ভালভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে।

উঠতি বয়সের ছেরেমেয়েদের আচরণের পেছনে এ প্রাকৃতিক রহস্য বড়রা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই বুঝতে পারবেন–কেন কিশোর বয়সে অনেক ছেলেমেয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণের চর্চাতেও মেতে ওঠে। এবং কোনও কোন ক্ষেত্রে মা-বাবার আপত্তি সত্ত্বেও অনেক অবাঞ্ছিত কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কিশোর-কিশোরীরা বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে যে পরিব্যাপ্ত নতুন সামাজিক জগতে প্রবেশ করতে থাকে, সেখানে তাদের মান-মর্যাদা অবস্থান সব কিছুই তারা নিজেরাই যাচাই করে নিতে চায় এবং সেই নতুন পরিবেশে তাদের জীবনধারা নিজেরাই গড়ে নিতে শুরু করে। মা-বাবার প্রয়োজন তখনও থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র যখন তারা সেই প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই তাঁদের শরণাপন্ন হতে চায়, অন্য সময়ে তাঁরা তাদের জীবন বিকাশের নতুন অভিযানে সহগামী হন, এটা তারা চায় না।

যে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের প্রকৃতিবলে এ বয়সে অর্জন করে থাকে, নিজের কাজ নিজে করার যে অমূল্য সামর্থ্য তাদের উল্লসিত করে রাখে, তারই মর্যাদা-সচেতনতা নিয়ে তারা সব রকম ছেলেমানুষি আচরণ ক্রমে পরিত্যাগ করে এবং বড়রা যে ধরনের আচরণ করে থাকেন, সে সব অভ্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু এর ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের বিগত বাল্যজীবনের সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে একেবারে বর্জন করতে পারে না, তবে তাদের বাল্যসুলভ আচরণ-অভ্যাসগুলোকে কৈশোর-জীবনের নতুন জগতের উপযোগী করে নতুনভাবে রূপ দেবার আন্তরিক চেষ্টায় মগ্ন হতে ভালবাসে।

এ বিবর্তন প্রক্রিয়া খুব সহজসাধ্য নয় মোটেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানাধরনের বিভ্রান্তি এবং অন্তদ্বন্দ্ব। অভিভাবক, মা বাবা সকলেই মনে করেন, তাঁদের কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েরা এখনও তেমনই ছোট ছেলেমেয়ের মতোই আছে–যাদের তাঁরা স্নেহ-ভালবাসা মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন, তাদের আরও বড় হয়ে উঠতে খানিকটা বুঝি এখনও বাকি আছে। এ জন্যই কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণের মধ্যে নতুন পরিবর্তনগুলোকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন না।

ঠিক সে রকম, কিশোর-কিশোরীদেরও নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে তাদের বয়সের ধর্ম মেনে চলার পথে-দেহ-মনের কত রকমের দাবি-দাওয়া মেটাতে হয় তাদের। তারা এ কারণেই অনেক সময়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতো কতগুলো কাজ লুকিয়ে আড়ালে করে ফেলতে চায়। সেসব কাজে হয় তো তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অভ্যাস থাকে না। তার ফলে, বহু ক্ষেত্রেই অসন্তোষ জাগে এবং কোনও কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দুঃখও তারা পায়।

মা-বাবা অভিভাবকদের বন্ধন ছিন্ন করে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসার এ যে প্রবণতা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে জেগে ওঠে, এটা তাদের বড় হয়ে ওঠারই স্বাভাবিক ধর্ম। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন কৈশোর ধর্মের এ বিচ্ছিন্নতা বোধের সঙ্কটময় পর্যায় সুষ্ঠুভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেই কিশোর-কিশোরীদের মনে জাগে তাদের সমাজ পরিবারের সকলের সঙ্গে নতুনভাবে উন্নততরে ভঙ্গিতে দৃঢ়তর সম্পর্ক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের প্রবল এক শুভ আগ্রহ।

বাস্তবিকই, কিশোর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্পর্কের শিথিলতা দেখে সকলেই মনে করে সেটা এক ধরনের বেয়াড়াপনা, বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে, ধৈর্য্য এবং সহানুভূতি সহকারে কিশোর-কিশোরীদের এ সঙ্কট পর্যায় অতিক্রমে সহযোগিতা করতে পারলে দেখা যায়, তারা দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষের যোগ্যতা নিয়েই গড়ে উঠছে।

ছাত্রাবস্থায় অনেকেই চায় তাদের সমবয়সীদের মধ্যে যতটা সম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে এবং এ বাসনা থেকে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে প্রায়ই গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা অবশ্য কিছুমাত্রই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সব মানুষেরই অন্যতম প্রধান চাহিদাই হল অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলা। এ বাসনা মানুষের সারা জীবনভরই থাকে, তবে বিশেষ করে কৈশোর-তারুণ্যের নানা শক্তি-বৈশিষ্ট্যের নিত্য নব বিস্ফোরণ চমকের পরিপ্রেক্ষিতে এ বাসনা স্বভাবতই অনেক তীব্র হয়ে আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। তাই, কিশোর-কিশোরীরা তাদের সমবয়সীদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা অর্জন করার চেষ্টায় নিবিষ্ট হয়ে থাকে।

কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের মা-বাবার আদর-যত্নের প্রভাব থেকে মুক্ত স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রীতি, ভালবাসা, মমতাবোধের আকুলতায় ছেলে এবং মেয়েরা উভয়ে উভয়ের কাছেই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ পেতে চায়। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায় যে, মাঝে মাঝে তাদের মনে যে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি এবং নিঃসঙ্গতাবোধ জেগে ওঠে, সেগুলো সহানুভূতি দিয়ে বুঝে সান্ত্বনা দেবার মতো সুহৃদ কেউ আছে তাদের সমবয়সী ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুদেরই মধ্যে।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের নিজস্ব জগৎ গড়ে ওঠে নিজেদের নিয়ে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, কাজকর্ম সব কিছুই হতে থাকে বিশেষভাবে। সেই আপন জগতের বিশিষ্টতার সঙ্গে সে নিজেকে এবং সবাইকে বেশ মানিয়ে চলতে পারবে না, সে হয় তো খানিকটা অতৃপ্তি বোধ করতেও পারে। যদিও-বা কোনও ছেলে-মেয়ে সেই বিশেষ জগৎ-পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতেও পারে, তবুও কিছু-না কিছু সমস্যা জাগতেই পারে। এমনি সমস্যার মধ্যে একটি গুরুতর সমস্যা হল–দলের মধ্যে মিলে মিশে চলার সময়ে অনেক কিশোর-কিশোরী বড় হয়ে ওঠার তাগিদে বা প্ররোচনায়, অনেক সময় মাদকদ্রব্য গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের নেশাচর্চা, এমন কি, যৌনচর্চার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহসিক আচরণের পরিমন্ডলেও পা দিয়ে ফেলে।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, কোনও কিছু নিয়ে নিয়মিতভাবে একটি বিশেষ আবেগ উপলব্ধি করার মানসিকতাকে বলে মনোভঙ্গি। আর, ধর্মচর্চা, যৌনতা, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, স্কুল জীবন, ছেলেমেয়েদের প্রেমচর্চা কিংবা এ ধরনের নানা বিষয় যেগুলো জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করে তাকে, সেগুলো সম্পর্কে কারুর মৌলিক বিশ্বাস এবং মনোভঙ্গিকে বলা হয় তার মূল্যবোধ।

এ যে মৌলিক বিশ্বাস তথা মূল্যবোধ সম্পর্কিত মানসিকতা, এ নিয়েই বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-তরুণরা প্রায়ই তাদের নিজেদের মধ্যে নানা-রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে, এমন কি, মা-বাবা, বড়দের সঙ্গে তা নিয়ে বেশ বিরোধিতামূলক তীব্র আলোচনাও করে থাকে।

এভাবে কারুর বিশ্বাস এবং ধারণা যাচাই করার ফলে আর তার প্রকৃত মূল্যবোধ কেমন ধরনের, তা নিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে, কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধির মূল্যবান সুযোগ লাভ করে–সেটা তাদের কৈশোর জীবনধারা বিকাশের পক্ষে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তাদের বয়স্ক জীবনের বৃহত্তর মানসিকতার প্রস্তুতি রচনায়।

কেউ যখন কোনও জিনিস আকুলভাবে পেতে চায়, কিন্তু সেটা পাবার জন্যে কিছুই করতে পারে না, তখন তার মনে যে রকম অনুভূতি জাগে, কিশোর-কিশোরীদের মনেও ঠিক তেমনই মনোভাব হয়, যখন ছেলেরা মেয়েদের সাথে এবং মেয়েরা ছেলেদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-সম্বন্ধ গড়ে তুলতে চাইলেও কিভাবে তার জন্য কোন্ পথে এগুতে হয় তা যদি না জানে।

এ ধরনের সঙ্কটজনক মানসিক পরিস্থিতিতে যে মনোভাব থেকে কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই কষ্ট পায়, তা হল, ব্যর্থতা-হতাশার আতঙ্কবোধ কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় সঙ্কোচ। কিভাবে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, মেলামেশা শুরু করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা থাকেনা বলে এই ধরনের সঙ্কট ছেলেমেয়েরা খুব নিরাপত্তার অভাববোধ করতে থাকে-সর্বদা একটা কিছু হারিয়ে ফেলার অজানা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে।

এ সঙ্কটকালে কিশোর-কিশোরীদের যৌন আবেগশক্তি বাস্তবিকই তুঙ্গে অবস্থান করতে তাকে, আর সে কারণেই, তাদের সমগ্র দৈহিক ও মানসিক সত্তার মধ্যে এ সঙ্কট বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করে, যার পরিণামে যে কোনও ছেলে বা মেয়ে তার যৌন অনুভূতি নিয়ে কি যে করবে, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনও বিশেষ পরামর্শ কোনও দিক থেকেই পায় না।

কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা এ ধরনের সমস্যাদির অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে নানাভাবে। আর, এ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতিক্রিয়াও হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের। প্রকৃতপক্ষে, এ সময়ে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি দারুণ আকর্ষণ আগ্রহ অনুরাগ উপলব্ধি করতে থাকে, তবে যেন তাদের কাছাকাছি না হতে পারলেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে বলে তাদের মনে হয়।

কত ছেলে কত সময় ব্যয় করে থাকে বহু মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে–তাদের সঙ্গে গল্পস্বল্প করে, এমন কি, বিরক্ত করে, সব সময়ে পেছনে লেগে থাকে, হাত জড়িয়ে কথা বলে, পথ চলে। এসব আচরণ হল তাদের যৌন আগ্রহ অভিপ্রকাশেরই মনো ভঙ্গি।

আবার, অনেক ছেলেমেয়ে আছে, যাদের কিশোর বয়সী বন্ধুবান্ধবীরা কেমন সহজ স্বাচ্ছন্দভাবে তাদের মনোমতো সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ঘুরতে ফিরতে বেড়াতে যেতে পারছে দেখে অন্যেরা ঈর্ষাবোধ করেও থাকে।

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও এ সব কিশোর-কিশোরীদের কাছে বিষম জটিল ব্যাপার। পৃথিবীর নানা দেশেই কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায় অতিক্রম করেই পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে দিয়ে বিবাহ-জীবনেও প্রবেশ করে আর পরিবার গড়ে তোলে।

এ দেশে কিশোর-কিশোরীদের ঐ ধরনের অবাধ মেলামেশা নানা কারণে এখনও অবধি তেমনভাবে প্রশ্রয় বা উৎসাহ পায়নি। ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, তার সঙ্গিনী বা সাথী বাছাই করে দেবার দায়িত্বটা পরিবারভুক্ত মা-বাবা এবং অভিভাবকরাই হাতে রেখেছেন–যে মেয়ে বা যে-ছেলের জন্যে সাথীর অনুসন্ধান করেন তাঁরা সেই ছেলে বা সেই মেয়েকে সেই বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ বিশেষ দেওয়া হয় না।

আমাদের সমাজে আজও বহু কিশোর-কিশোরী আছে, যারা তারুণ্যের বয়ঃসন্ধিকালে পৌছবার পরেও ছেলেরা মেয়েদের সাথে এবং মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে বেশ অস্বস্তি এবং বিচলিত বোধ করে থাকে। এ বয়সের অনেক ছেলেমেয়েই আমাদের দেশে সহশিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা পায় না। অর্থাৎ স্কুলের পরিবেশে ছেলেদের এবং মেয়েদের সাধারণত একসঙ্গে পড়বার ব্যবস্থা নেই। সে কারণেই বাড়ির পরিবেশে তারা যে ভাবধারায় গড়ে ওঠে, সেভাবেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়ে থাকে।

কিছু ছেলেমেয়েদের জীবনে যখন পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শে কিংবা প্রগতিশীল পারিবারিক আদর্শে উদারতার পরিবেশ রচিত হয়, তখন হয় তো ছেলেরা মেয়েদের সাথে এবং মেয়েরা ছেলেদের সাথে মিলেমিশে এখানে-সেখানে বেড়াতে যায়, এমন কি, ঘনিষ্ঠতার মধুর আচরণের মধ্যেও নিমগ্ন হবার সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তাদের মধ্যে যৌনতার উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া এবং তা নিয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময়ও খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীই এ ধরনের আচরণ এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জগতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ কিংবা এ ধরনের জীবন-বিকাশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। সে কারণেই এসব ছেলেরা মেয়েদের সাথে বা মেয়েরা ছেলেদের সাথে খুব সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে মেলামেশা করে না।

অবশ্য, দিনকাল বদলে গেছে। শুধু তাই নয়, ছেলেমেয়েদের যৌনতা বোধ সম্পর্কে সমাজের মানুষের মনোভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তবে, একথা বলা চলে না যে, আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা সমাজে সবকিছু করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেছে বা যাচ্ছে। যদিও, স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, যৌনতা বোধের উপযোগিতা সম্বন্ধে আজকের অভিজ্ঞ নারী-পুরুষের মনে অনেক সহজ ধারণার পরিবেশ রচিত হয়েছে।

সমাজের সামগ্রিক নীতিবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌টা ভাল বা খারাপ কোন্‌টা উচিত বা অনুচিত, বিশেষ করে যৌনতা বিষয়ক আচার-আচরণ, ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোন্‌টি কতখানি অনুমোদনযোগ্য, তার বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে, মানুষের নিজস্ব নীতিবোধের ভিত্তিতেই তা স্থির করা হয়।

সচরাচর, এধরনের কোনও সম্পর্ক-সম্বন্ধ গড়ে তোলার সময়ে ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের মা-বাবার সঙ্গে একান্তে একটু পরামর্শ করতে ইচ্ছা করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে,

বন্ধুমহলে এবং সামাজিক পরিবেশে তাদের মনোভঙ্গির যথাসম্ভব অভিব্যক্তির মাধ্যমেও ছেলেমেয়েরা তাদের পথনির্দেশ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। তা ছাড়া, তাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও শিখতে পারে–ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলামেশার পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি কতখানি ভাল বা মন্দ।

এভাবে শেখার প্রধান উপায় হল–প্রশ্নের মাধ্যমে নানা সমস্যার উপস্থাপন। ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে এবং মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে তাদের ভাব-ভালবাসার বিনিময় চর্চা করবে, গভীরভাবে মেলামেশা করবে এবং পরবর্তী বিবাহ-জীবনে কিভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে, নানা ধরনের কৌতূহল মেশানো প্রশ্নাদির মাধ্যমে তারা সেগুলো উপস্থাপন করতে চায়।

ঐসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে পারলে সামাজিক জগতের বিভিন্ন মূল্যবোধ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের মনের মধ্যে যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে, সেগুলো অনেকাংশে প্রশমিত হবার সুযোগ পেতে পারে। তখন খানিকটা পথনির্দেশ, আন্তরিক সহানুভূতি-সহযোগিতার মনোভঙ্গি তাদের জন্য থাকলে, তারা নিজেরাই নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে তোলার দুরুহ ব্রত সুসম্পন্ন করতে পারে, নির্ভীক আত্মবিশ্বাস সহকারে যে কোনও সামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে।

এভাবে তারা নিজেদের জীবন-বিকাশের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের জন্য সচেষ্ট হতে পারলে উদ্দেশ্য সার্থক হয় এবং দেহ-মনের বয়সোপযোগী সম্যক বিকাশ সাধন তাদের জীবনে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যেমন কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করে, কেন ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না। সমাজে এ বিধিনিষেধ কিভাবে বদলানো যায়, তাও তারা জানতে চায়।

তখন ছেলেমেয়েদের বোঝানো খুবই দরকার হয়ে পড়ে যে, এটা আমাদের সমাজের জীবন-বিকাশ রীতির একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে ছেলে এবং মেয়েদের পরস্পরকে জানাশোনা, তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা যতটা সম্ভব নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ সমাজে পুরুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়, যাতে সে বড় হয়ে উঠে নারীকে উপদেশ-নির্দেশ দেবার মনোভাব গড়ে তোলে অর্থাৎ নারী বড় হয়ে ওঠে পুরুষের অধীনে বাধ্য হয়ে থাকার জন্যেই।

এছাড়া, ছেলে এবং মেয়েরা খুব কাছাকাছি এলে তাদের দেহে মনে যৌন আকর্ষণ জাগে আর তা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইচ্ছে হতে বাধ্য, তার নানারকম কুফল থেকে ছেলেমেয়েদের সযত্নে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

তাই, ছেলেমেয়েদের বোঝাতে হবে যে, সমাজে যতই প্রগতিশীল মনোভাবের বিকাশ ঘটবে এবং নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদার ধারণা ব্যাপকতা অর্জন করবে, ততই ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে এ ব্যবধানের কঠোরতা হ্রাস পেতে থাকবে।

আবার, অনেক কিশোর-কিশোরী জানতে চায়, আমাদের দেশে ছেলে এবং মেয়েদের পরস্পরকে ভাল লাগলে এবং ঘনিষ্ঠতার আচরণ লক্ষ্য করলে কেন সবাই খারাপ চোখে দেখে।

এ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের বোঝানো যেতে পারে যে, পরস্পরকে ভাল লাগা এবং কাছাকাছি আসা কারুর কাছেই খারাপ লাগে না। তবে, সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ স্থির করা হয় বড়দের মাধ্যমে দেখা-শোনা বিচার-বিবেচনার পথ ধরে। সে কারণেই বিবাহের আগে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে

পারস্পরিক চেনা-জানার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখা যায় না। কারণ, বিবাহের আগে পরিচিতি বোধ সৃষ্টি হলে, পারস্পরিক আকর্ষণ কমে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা, তেমনি যৌবনোচিত ভাবাবেগের প্রাবল্যে তীব্র অদম্য আকুলতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাব্যতাও কম থাকে না। উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিভিত্তিক জীবন-সাথী মনোনয়নের ব্যাপারে বড়দের সুচিন্তিত উদ্যোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

কিশোর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের পারস্পরিক চেনা-জানা বা ঘনিষ্ঠ আচরণের বিরোধিতা করার আরও একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হল এ যে, ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময়ে উভয়ের দেহে মনে যে ধরনের পুলক অনুভূতির মাধুর্য সঞ্চারিত হয় এবং তার ফলে সাময়িকভাবে পারস্পরিক বিশ্বাস-প্রপ্রীতি জন্মায়, তা থেকে যৌন আদর, এমনকি, সঙ্গমের প্রস্তাবনাও সৃষ্টি হতে পারে.এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়েও থাকে।

সে ধরনের প্রস্তাবনাময় পারস্পরিক সম্মতি গড়ে উঠলে অবুঝ আবেগপ্রবণ ছেলেমেয়েরা নিছক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তাড়নায় সন্তানসম্ভাবনার জন্য দায়ী হয়ে পড়তেও পারে।

এর পরে নানাপ্রকার সামাজিক কারণে তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব না হলে, সমাজে সন্তানসম্ভবা মেয়েটির জীবন নিন্দনীয় হয়ে ওঠে, তার জীবন-দর্শনের আকাশে তুমুল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় এবং জীবনধারা দুর্বিষহ মনে হতে থাকে। কিন্তু ছেলেটির জীবনে তেমন কোনও বিক্ষোভ জাগে না।

এ কথাও কিশোর কিশোরীদের মনে জাগে যে, তারা যদি মেলামেশা করে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ-সুবিধা এবং অনুমতি না পায়, তা হলে কেমন করে পরস্পরকে ভালভাবে চেনাজানা সম্ভব হতে পারে।

এ বিষয়ে তাদের বলা দরকার যে, ছেলে এবং মেয়েরা কিশোর বয়সের প্রাকৃতিক আকর্ষণে কাছাকাছি এলে মেলামেশা চেনাজানার মাধ্যমে স্বাভাবিক আগ্রহ-মাধুর্য সৃষ্টি হতেই পারে তবে, সেই মধুর সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, ভাবাবেগাপ্লুত হয়ে একজনকে হয়তো কখনই যথাযথভাবে চিনতে পারা, তাকে গভীরভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নাও হতে পারে।

পরস্পরকে ঠিকভাবে চেনা-জানার ব্যাপারটি একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, আর সেটা যথাযথভাবে সম্ভব হয়, যখন কেউ কারুর সঙ্গে তার জীবনের সব রকম সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনধারার মাধ্যমে ভাবাবেগবর্জিত মানসিকতা নিয়ে, বেশ কিছুদিন একাদিক্রমে নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম পালন করে চলবার সুযোগ পায়।

এ জন্যেই মা-বাবা, অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের কল্যাণ-চিন্তা নিয়েই তাদের বংশপরিচয়, সামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মক্ষমতা এবং আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েও যুক্তিভিত্তিক বিচার-বিবেচনা করে থাকেন।

অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আশা এ যে, ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মোটামুটি সমপর্যায়ের হলে তারা তাদের জীবনযাত্রায় মানিয়ে চলার ব্যাপারে অনেকটা সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে, পরস্পরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে বেশ চলতে পারবে।

সে কারণেই আমাদের সমাজে মনে করা হয় যে, সামাজিক বিকাশের বিবেচনায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, চেনাজানা এবং ঘনিষ্ঠ আচরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও, তার মাধ্যমে যে তারা সুযোগ্য সুসামঞ্জস্য জীবনসাথী খুঁজে পাবে সহজে, এমন কথা জোর দিয়ে কেউই বলতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেলেই বড়রা তাদের বলে দেবেন যে, প্রকৃত আন্তরিক প্রেম ভালবাসা আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভের আকর্ষণজনিত আবেগ উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোথায় কতখানি পার্থক্য আছে। এ সচেতনতা ছেলেমেয়েদের অবশ্যই থাকা দরকার। যদিও এ সূক্ষ্ম প্রভেদ অনুধাবন করা অল্পবয়সী আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার, তবু এ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা করতে শেখানো প্রয়োজন, যাতে তাদের আবেগপ্রবণতার দিকেই পাল্লাভারী না হয়ে পড়ে।

কিশোর-কিশোরীদের প্রেম, ভালবাসা, এবং বিবাহ-ধারণার গুরুত্ব নিয়ে যাঁরা বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁরা অবশ্য এ বিষয়ে যে সব পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেগুলো অনেকটা সহায়ক হতে পারে বলেই মনে হয়।

এ পরামর্শগুলো কেবলমাত্র কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই নয়, বিবাহাকাঙক্ষী সমস্ত তরুণ-তরুণীর বিবাহের আগে সম্ভাব্য প্রেম ভালোবাসার স্বরূপ নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও সবিশেষ প্রযোজ্য।

সেই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য পরামর্শগুলোর সারমর্ম হল ঃ

১. প্রেম ভালবাসা সময়সাপেক্ষ এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, কিন্তু ইন্দ্রিয় আকর্ষণজনিত আবেগ উচ্ছ্বাস অকস্মাৎ বেড়ে উঠে আকুলতা সৃষ্টি করে।

২. কাউকে নানাভাবে নানা সময়ে লক্ষ্য করার পরে সাধারণত প্রেম ভালবাসা জাগতে পারে, কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাললাগা প্রথম দর্শনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে।

৩. কারুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তার প্রতি প্রেম ভালবাসার উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসজনিত ভাললাগা সৃষ্টি হয়ে থাকে কারুর দু'একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যেমন–দেহসৌষ্ঠব, খেলাধূলা বা কোনও বিষয়ে দক্ষতা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে।

৪. প্রকৃত প্রেম ভালবাসা মানুষের দোষ-গুণ যাচাই করার পরে তার আদর্শ মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসজনিত ভাললাগার মধ্যে বাস্তববোধের অভাবই লক্ষ্য করা যায়।

৫. কারুর দীর্ঘকালীন প্রকৃত কল্যাণচিন্তার মাধ্যমে এবং যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সেসব তার প্রতি সমর্পণের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রেম ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে যে ভাললাগার জন্ম হয়, তা হয় নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক, তাৎক্ষণিক বর্তমান তৃপ্তিসুখ উপভোগের প্রত্যাশী এবং নানারকমের প্রাপ্তিযোগে আগ্রহী।

৬. প্রেম-ভালবাসার বৈশিষ্ট্য হল আত্মবিশ্বাস, ভরসাবোধ এবং মানুষের ওপর বিশ্বাসের মর্যাদাবোধ, কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাল লাগার মধ্যে থাকে পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থবোধ এবং অহরহ দিবাস্বপ্ন চর্চা অর্থাৎ হরেক রকম জল্পনা-কল্পনার আধিক্য।

৭. প্রেম-ভালবাসার মনোভঙ্গি নির্ভীকভাবে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে, সমাধান খুঁজে বার করে এবং যুক্তি সম্মতভাবে স্থায়ী বিবাহ সম্বন্ধ গড়ে তোলার পথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারণের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে কাউকে ভাল লেগে থাকলে সব কিছু বাধা-বিপত্তিকে অসহনীয় বলে মনে হয় এবং সেগুলোকে নিতান্তই মূল্যহীন প্রতিবন্ধক মনে করে বিদ্রোহীভাবাপন্ন হয়ে দ্রুত বলপূর্বক সরিয়ে দিতে চায়।

অবশ্য, অনেক ছেলেমেয়ে কৈশোর-তারুণ্যের বয়সে বিবাহ সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। এ অনীহা বা অনিচ্ছার মনোভাব নিতান্ত ছেলেমানুষী মানসিকতা নয়।

অনীহা তারই একটা প্রতিফলন। এ কারণেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ-প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করে বসে–বিবাহ করে কি হয়?

এ ধরনের প্রশ্ন ছেলেমেয়েদের মুখে শুনে বড়রা প্রায় সকলেই ঠাট্টা-তামাসা করে হেসেই উড়িয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্ন কিশোর-কিশোরীদের মনের সামাজিক অভিজ্ঞতা-পুষ্টির এক অতি বাস্তব অভিব্যক্তি।

ছেলেমেয়েরা যখন কোনও বিবাহ-উৎসবে যায়, সেখানে দেখে আনন্দের উচ্ছলতা। আবার নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে তারা অহরহ দেখে বেদনাও অনুভব করে যে, বিবাহোত্তর জীবন কত নিত্য সঙ্কটময়। তারা তাই ভাবতেই শেখে–বিবাহ না করে ছেলে আর মেয়েরা বন্ধু হয়ে থাকলেই তো পারে।

এ কারণেই তাদের মনের দ্বিধাগ্রস্ত দ্বন্দ্ব নিরসন করার উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, বিবাহ মানে অনেক দায়-দায়িত্ব, অনেক প্রতিশ্রুতির জগতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকা, এবং সেটাই হল বড় হয়ে ওঠার শুভ লক্ষণ।

তাদের জানিয়ে রাখা উচিত–বিবাহ-জীবনে ছেলে আর মেয়ে দুজনেই তাদের কার্যকলাপের জন্যে সমানভাবে-দায়ী হয়ে থাকে। বিবাহিত নারী-পুরুষের সন্তানেরাই আইনসঙ্গত নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা পেয়ে থাকে। সে সব সন্তানের যথার্থ পৈতৃক পরিচিতি থাকে এবং মা-বাবার যত্নের ওপর তাদের দাবি থাকে।

এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরাও বড় হয়ে সভ্য সমাজে তাদের বয়স্ক-জীবনের প্রকৃত মর্যাদা দাবি করতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ থেকেও সর্বক্ষেত্রে বিবাহিত পরিবারের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নীতি অনুসরণ করা হয় সর্বকালে সর্বদেশে।

অতএব, বিবাহ-জীবন না মেনে ছেলে আর মেয়েরা শুধুই বন্ধু হয়ে বয়স্ক জীবনে প্রবেশ করতে চাইলে, সেটা তাদের নিজেদের পক্ষেই হবে মর্যাদাহানিকর এবং সভ্য সমাজে দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক।

বর্তমান প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিবাহ-ধারণার গুরুত্ব সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ইদানিং প্রচারিত হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রতি এদেশের কিশোর-কিশোরীদের মনোযোগ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছে বলেই কোনও কোনও সদ্যবিকশিত তরুণ-তরুণী বলে ওঠে–বিবাহ নিতান্তই একটা সামাজিক উৎসব। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে, কিশোর-কিশোরী তথা তরুণ সমাজের চিন্তা-বিকাশের সূত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এ ধরনের মনোভঙ্গি।

সেই বিবেচনায় কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের বুঝতে সাহায্য করা উচিত যে, বিবাহ অনুষ্ঠানটি নিতান্তই একটা সামাজিক উৎসব মাত্র নয়। বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য যে বিভিন্ন জনের মানসিকতার ওপরেই মূলত নির্ভর করে থাকে, এটা কিশোর-কিশোরীদের যথাসময়ে বুঝতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিবাহ-জীবনকে সার্থক করে তোলার ইচ্ছা আগ্রহ চেষ্টা সব কিছুই যখন ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই প্রকৃত সাংগঠনিক উদ্যোগ সহযোগে যথাযথভাবে এগুতে থাকে, তখন ছেলে এবং মেয়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সুষমা ধারণ করতে থাকে, যার মাধ্যমেই সার্থকতা লাভ করে থাকে বিবাহ-জীবন।

এ বিবাহোত্তর সাংগঠনিক উদ্যোগের সবটাই নির্ভর করে বিবাহবদ্ধ দুই ছেলেমেয়ের মনোভঙ্গির ওপরে-তারা কিভাবে পরস্পরের পরিপূরণে তাদের উভয়ের জীবনকে ফলবতী করে তোলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলবে, তারই ওপরে;-শুধুমাত্র বিবাহ করে সমাজের ছাড়পত্র নিয়ে এক সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যেই নয়। প্রথমে যে পরিপূরণমূলক সহযোগিতাভিত্তিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হল, তার জন্যে ছেলে এবং মেয়ে দু'জনকেই কাজে লাগাতে হয় তাদের অনেক চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম এবং সহনশীলতা।

অনেক সময়ে আবেগ উচ্ছ্বাসের ফলে কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা প্রেম-ভালবাসার চরম পর্যায়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে যৌন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যোগ্যতা লাভ করেছে বলে মনে করে এবং তাড়াতাড়ি বিবাহ করতে চায়, যাতে সেই অধিকার উপভোগ করতে পারে।

এ কারণেই, প্রেম ভালবাসার চর্চায় কিশোর-কিশোরীরা অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে, তা বুঝতে পারলেই বড়দের উচিত তাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহানুভূতির সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। এ কাজে বড়রা সঙ্কোচভরে বা অভিমানভরে বিফল হলে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

ছেলেমেয়েদের সুকৌশলে গল্পছলে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, বিবাহ-জীবনটা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের মাধ্যমে মজা করার জন্য মোটেই নয়–বিবাহ করতে হলে ব্যাপক দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী পরিণত দেহ-মন থাকা চাই যে কোনও মেয়ের এবং আর্থিক স্বনির্ভরশীলতা একান্তভাবেই প্রয়োজন প্রত্যেক ছেলের। এ হলে, তখন দুটি ছেলেমেয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।

তা ছাড়া, অল্প বয়সে ভাবাবেগের তাড়নায় বিবাহ করলে মেয়েদের সেই অল্প বয়সেই সন্তান ধারণ এবং সন্তানকে পালন করার গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। তবে, অনেকের যুক্তি এ যে, অল্প বয়সে বিবাহ করে সন্তান লাভ হয়ে গেলে নিজেদের বার্ধক্য অবধি সন্তানের স্বনির্ভরতা নিয়ে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা অনেকটা কমে যায়।

কিন্তু জীবন-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ এ যে, অতি অল্প বয়সে কিংবা বেশি বয়সে বিবাহ, দুটির মধ্যেই কিছু কিছু দোষত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণে, যৌবনের মধ্য পর্যায়ে বড়দের পরামর্শ নিয়ে বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখানোই ভাল।

বিবাহের সঠিক বয়স সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সঠিক ধারণা থাকে না, কারণ তারা তাদের দেহগত বিকাশ পরিণতি, মানসিক প্রস্তুতি এবং সামাজিক স্বনির্ভরতার মাপকাঠি অল্প বয়সে কাজে লাগাতেই জানে না। বিশেষ করে মেয়েদের দেহের মধ্যে তাদের বিবাহের আগে জনন-প্রক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সে কারণেই মেয়েদের বিবাহ অবশ্যই হওয়া উচিত ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে। ২০ বছর বয়সের আগে কোনও মেয়ে বিবাহ করলে, কিংবা প্রেম ভালবাসার আবেগে ইন্দ্রিয় সুখ-তৃপ্তির তাড়নায় যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হলে সন্তান সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নানা সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে, শারীরিক স্বাস্থ্যহানির অনেক কারণ ঘটতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের একথাও সময় থাকতে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে প্রেম ভালবাসা চর্চার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে মা বাবা অভিভাবকদের পরামর্শে সামাজিকভাবে দেখাশুনার মাধ্যমে বিবাহ হওয়ার ভাল দিক অনেক আছে। এ কারণেই এদেশে বলা হয়ে থাকে, 'বর দেখার আগে ঘর দেখা চাই'।

পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড়রা ছেলে ও মেয়ের নিছক ভাবাবেগ বাদ দিয়ে তাদের দুজনের শুদ্ধ আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব তুলনা করে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা করে থাকেন, তার মধ্যে বংশ মর্যাদা, পণ বিনিময় এবং যৌতুকাদির দেনা-পাওনা নিয়ে অত্যধিক হিসাবনিকাশ না থাকলে তার মানসিক ও সামাজিক ফল ভাল হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে।

এ ছাড়া, আরও এক পদ্ধতিতে বড়রা ছেলেমেয়েদের বিবাহসম্পর্ক স্থির করতে চেষ্টা করে থাকেন, সেটা হল ঠিকুজি কোষ্ঠি বিচার। এ সম্পর্কে আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি ঠাট্টা-তামাসা করলেও এর পেছনে যুক্তি হল এ যে, কোনও মানুষের জন্মক্ষণের রাশিনক্ষত্রের প্রভাব বিচার-বিশ্লেষণ করে জ্যোতিষবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হিসাব অনুসারে কোনও মানুষের আচার-ব্যবহার, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, জীবনধারা কর্মক্ষমতা প্রভৃতির খানিকটা ধারণা করা যায় বলেই যুগ যুগ ধরে লক্ষ্য করা গেছে।

যদিও জ্যোতিষবিজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণগুলো গাণিতিক হিসাব নিকেশ ছাড়াও অনেকাংশে সম্ভাব্যতার তত্ত্ব (প্রোব্যাব্‌লিটি) অনুসরণ করেই থাকে, তাহলেও ছেলে এবং মেয়ের অজানা ভবিষ্যতের যতটা সম্ভব ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য তাদের কল্যাণকামী বহু অভিভাবক-অভিভাবিকাই এ পদ্ধতির স্মরণ আজও নিয়ে থাকেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

জ্যোতিষবিজ্ঞানের গাণিতিক সম্ভাব্যতার তত্ত্ব অনুসরণ করে অভিভাবকরা মানসিক ভরসা পেতে চান যে, তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে যথাসম্ভব উপযুক্ত বিবাহসূত্রেই সমর্পণ করতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে, যখন ছেলে বা মেয়ের পারিবারিক বা বংশগত বৈশিষ্ট্যের যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হত না, তখনকার দিনে জ্যোতিষবিজ্ঞানের সাহায্যেই বিবাহসূত্র গড়ে তোলা হত।

আধুনিক যুগে যুক্তিভিত্তিক সমাজ-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার মনোভাব যে ভাবে গড়ে উঠেছে এবং যতখানি নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মনঃশক্তির প্রভাবে কিশোর-কিশোরীদের প্রেম-ভালবাসা ঘটিত বিবাহসূত্র প্রায়ই বড়দের সমর্থনে গড়ে উঠেছে—তার ভাল-মন্দ দু'রকমেরই ফলাফল আমাদের চোখের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি।

সে জন্য শুধু মাত্র কিশোর-কিশোরী নয়, তাদের মা-বাবা অভিভাবক-অভিভাবিকারাও জ্যোতিষবিজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর না করে যথাসম্ভব নিজেদের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ের বিচার-বিবেচনা দিয়েই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ বন্ধন গড়ে তুলছেন। তাই, আজকাল ছেলেমেয়েদের আগ্রহ অনুরাগ পছন্দগুলোই তাদের জীবনসাথী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পেয়ে থাকে প্রাধান্য।

যাই হোক, জ্যোতিষবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ কিংবা ছেলেমেয়েদের আগ্রহ অনুরাগের বিশ্লেষণ—যে পদ্ধতিতেই বিবাহসূত্র গ্রথিত হোক না কেন, বিবাহের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে থাকে দু'জনের পারস্পরিক প্রচেষ্টার ওপর, তাদের দেহ-মন ও সমাজের বৈশিষ্ট্যের ওপর। সেই সাফল্যের পথে বড়দের পূর্ণ সহানুভূতি এবং সহযোগিতা যে ছেলেমেয়েরা সব সময়েই পাবে, এ আশ্বাস তাদের দিয়ে রাখা খুবই দরকার।

বিবাহ-ধারণার ক্ষেত্রে কৈশোর পর্যায় থেকেই ছেলেমেয়েরা বিষম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকে এ পারস্পারিক প্রচেষ্টার পদ্ধতি এবং সাফল্য সম্পর্কে। বড়রাই যে প্রচেষ্টায় বিব্রত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেই প্রচেষ্টার অগ্রিম ধারণা গড়ে তোলা অপরিণত কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে নিশ্চয়ই অতীব দূরুহ কাজ।

আজকের স্বাধীন মনোভাবাপন্ন তরুণ সমাজে, মুক্তি প্রগতির আধুনিক পরিবেশে, স্বতন্ত্র ভাবভঙ্গি রুচি অনুরাগ অক্ষুণ্ন রেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা গড়ে তোলার যে ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধ্যান-ধারণা এ রকম যে, বিবাহ-জীবনেও সেই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেই সার্থক জীবন-দর্শন অনুসরণ করা উচিত।

অন্যদিকে, প্রেম-ভালবাসার আবেগ-প্রবণতার প্রভাবে এ কথাও তারা অন্তরে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে থাকে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পারস্পরিক সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ন রাখা এক কঠিন ব্রত। পরস্পরের প্রতি অনুগত না হলে যেমন অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব, তেমনই অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ না করতে পারলে পারস্পরিক সামঞ্জস্য সৃষ্টিও দুঃসাধ্য।

ছেলেমেয়েদের মুক্তি-প্রগতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি অনেক কিছু ধ্যান-ধারণা নিয়েই আধুনিক শিক্ষা এবং সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে কিশোর-তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে তাদের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য এবং সংযমবোধ সম্পর্কে নৈতিক পরামর্শ যথাযথভাবে বড়রা দেন না।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাধীন সত্তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ কথাও বুঝতে সুযোগ দিতে হবে যে, অত্যধিক স্বাধীন স্বতন্ত্র্যবোধ বা অত্যধিক আত্মসমর্পণ কোনটাই পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করতে সাহায্য করে না। বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা এবং মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় অন্যের স্বাতন্ত্রবোধের সঙ্গে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান সমাজে পরিবার সংগঠনের কাঠামো গড়ে উঠেছে মূলত এভাবেই।

কৈশোরে যৌন আচরণের গতি-প্রকৃতি

বড়রা যতই অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদের লাগাম টেনে রাখতে চেষ্ট করুন, ঘনিষ্টতার অবকাশ তারা করে নেবেই। এ জন্যেই অপরিণামদর্শী অনিয়ন্ত্রিত গভীর ঘনিষ্ঠতার এবং ফুর্তির অবাঞ্ছিত ফল সমাজে প্রকটিত হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

কিশোর-কিশোরীদের ঘনিষ্ঠতার আকর্ষণ অনস্বীকার্য সত্য। একে খারাপ, অশ্লীল, পাপ, অসভ্যতা, নোংরামি–এ সব বলে দূর করা কখনও যায়নি, যাবে না, উচিতও নয়। কিশোর-কিশোরীদের ঘনিষ্ঠতার চর্চা উঠতি বয়সের স্বাভাবিক বিকাশ বলেই জানতে হবে এবং সে কথা ভেবে তাদের সঠিক পথ দেখাতে হবে।

এ ধরনের আলোচনার মধ্যে যৌন প্রেমের কথাও আসবে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কিশোরও কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে যৌন বাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে এবং যথোপযুক্ত যৌন বিজ্ঞান জানা না থাকলে, অন্ধ আকর্ষণের ফলে যৌন অভিজ্ঞতা লাভের অদম্য কৌতূহলে কিশোর-কিশোরীরা প্রায় পরস্পরের এমন কি, সমাজেরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে বসে।

অনেকে ভাবতে পারেন, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের এসব বিষয়ে আলোচনায় উৎসাহ দিলে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক যে অভিজ্ঞতা লাভের আগ্রহ দেহ-মনের মধ্যে জেগে ওঠে, সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করে রাখলে, তরুণ-তরুণীরা অভিজ্ঞতার তিক্ত রূপটাও কোন দিনই ভালভাবে বুঝতে শিখবে না। আর তা ছাড়া কেবলমাত্র বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটক করে রাখতে চেষ্টা করলেই কাউকে অভিজ্ঞতা অর্জনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস থেকে নিরস্ত করা যায় না।

জোরে মোটরগাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটে বলে মোটরগাড়ি চড়তে বা মোটরগাড়ি জোরে চালাতে বারণ করলে বিশেষ ফল লাভ হয় না। মোটরগাড়ি চালানোর ক্ষমতা যার আছে, সুযোগ পেলেই মনের আনন্দে প্রচন্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে নেবার অভিজ্ঞতা লাভ করতে সে চাইবেই।

সে ক্ষেত্রে জোরে মোটর চালানোর কায়দা-কৌশলগুলো ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়াই হল দুর্ঘটনা রোধ করার সবচেয়ে ভাল উপায়। বলে দিতে হবে, জোরে গাড়ি চালালে গাড়ির আয়ুক্ষয় হয়, চালকের উদ্বেগ বাড়ে। আরও বলতে হবে, একান্তই জোরে গাড়ি চালাতে নেই, মদ খেয়ে চালানোও বারণ, রাস্তার মোড়ের মাথায় কিংবা ভিজে রাস্তায় জোরে চালাতে নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি, কিশোর-কিশোরীদের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারেও খোলাখুলি পথনির্দেশ না দিলে তারা কোনও না কোন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ এক্স্‌পেরিমেন্টের অদম্য কৌতূহলে গোপন অভিসারে ভুল কাজ করে বসতেও পারে। করছেও। অবিবাহিতা মায়েদের সংখ্যাও তাই পৃথিবীর সব দেশেই বাড়ছে, আমাদের দেশেও। এগুলোকে যৌন অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠতার ফলে যে ধরনের যৌন আচরণের গতি-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলান্ডে ডাঃ অসটেস চেসার নামে এক বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ষাটের দশকে। ডাঃ চেসার যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটি চেসার রিপোর্ট নামে খ্যাতিলাভ করেছে।

সে ডাঃ চেসার তাঁর রিপোর্টে বলেন, কিশোর-কিশোরীদের গভীর ঘনিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে নানা ধরনের যৌন আচরণ চর্চার কৌতূহল বর্তমান সমাজে হয়ে উঠেছে খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং ঘনিষ্ঠ আচরণের প্রবণতাকে সন্দেহ এবং ঘৃণার চোখে না দেখে সঠিক পথ দেখানোই বোধ হয় উচিত, যাতে অপরিণত কিশোর-কিশোরীরা নিছক এক্স্‌পেরিমেন্‌টের খেয়াল-খেলায় সামাজিক সমস্যাকে বাড়িয়ে না তোলে। কথাটা খুবই যথার্থ।

ডাঃ চেসার একজন মর্যাদাসম্পন্ন প্রবীণ ডাক্তার হলেও বলেছেন, কিশোর-কিশোরীদের যৌন অভিজ্ঞতা লাভের কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক জানা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে কৌতূহল চরিতার্থ হতে দেওয়ার পথনির্দেশ নাকি সমাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

একটা কথা মানতেই হবে, এ যুগের কিশোর-কিশোরীরা খুব তাড়াতাড়ি যৌন চেতনা লাভ করছে। সে ক্ষেত্রে তাদের যা কিছু জানা দরকার, তা সময় থাকতে জানানো দরকার। 'খবরদার' বলে অন্ধকারে ঠেলে রাখলে বিপদ-দুর্ঘটনার হাত থেকে তাদের বাঁচানো যায় না। তাদের পথে চলা শেখাতে হবে। কৌতূহলের যে-ক্ষুধা আজ কিশোর মনে জেগেছে, তার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে বলেই সমাজ-বিজ্ঞানীদের অভিমত।

নীতিবোধ বদলাচ্ছে

মনে রাখতে হবে, নীতিবোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনোভাবও বদলে গেছে। সংরক্ষণশীল লোকেরাও আজকাল কিশোর-কিশোরীদের মেলামেশা, ভাব-ভালবাসা এ সবগুলো একটু সতর্কতার সঙ্গে হলেও মেনে নিচ্ছেন। তাঁরা বুঝেছেন, আজকের দিনে নীতিবাগীশ হয়ে কড়া হুকুম দেওয়াটা বেমানান হয়ে পড়েছে। কোনও রকমে শান্তি বজায় রাখাটাই সবার কাছে আজ পরম নীতিগত দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে যে সব নীতি চলে এসেছে, শ'খানেক বছর আগেও তা নিয়ে খুব কম লোকেই আপত্তি তুলত। নিয়মভঙ্গ হয় তো অনেকেই করত, কিন্তু নিয়মের শাসনকে ভয় করত। অনিয়ম যে করত, সে বুঝত পাপ করেছে। আজ ঐ সব বদলে গেছে। এখন তার নীতিবোধের কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। পুরনো ধারা আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

একে যদি নীতিবোধের অবনতি বলা হয়, তা হলে অনেক কথা আসে। অনেকে একে বলেন, মুক্তি-প্রগতি। পুরনো রীতি সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে নতুন রীতি সর্বত্র গৃহীত হয়নি বলে এর ফলে খানিকটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে–কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝতে অনেকে পারছে না।

এখন সমাজ ব্যবস্থাটাকে নতুন করে আগাগোড়া ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছে, যাতে নতুন ব্যবস্থাটা সকলের পক্ষে সমানভাবে বোধগম্য হতে পারে সহজেই। মোহেনজাদারো কিংবা বৌদ্ধ যুগে যে নীতিবোধ ছিল, আজও তার মাপকাঠিতে আধুনিক তরুণ সমাজের আচরণ বিচার করতে গেলে তারা শুনতে চাইছে না।

বিশেষ করে যৌন চেতনা সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা করা খুব দরকার হয়ে পড়েছে। কৈশোর পর্যায়ে যৌন চেতনাকে কেবল খারাপ বলে নিন্দে করলেই চলবে না; এ পরিবর্তিত চেতনাকে ঠিক পথ দেখানো দরকার।

আমরা এখন যুগ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। প্রবীণ আর নবীনের মধ্যে তফাৎ খুব বেশি চোখে পড়ছে। আরও মুশকিল হয়েছে, প্রবীণরা নীতিবোধের এমন পরিবর্তন দেখে অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্বস্তি বোধ করছেন, তাঁদের মধ্যে মতভেদ জাগছে।

এসব পরিবর্তন ভাল কী মন্দ, সে বিষয়ে সত্যিই নানা জনের নানা মত। বিভিন্ন জনের বিশ্বাস ও ধারণার ওপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর করে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে, যা ঘটছে তার মধ্যে সোজাসুজি স্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

যাঁরা বলেন, আমরা সব রকম নীতিবোধ হারিয়েছি, আমাদের সমাজ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা সামাজিক বিধিনিষেধ আর মানতে চাইছে না, তাঁদের কথা কতখানি সত্যি? পুরনো দিনের সমাজ কি এতই ভাল ছিল যে, সেযুগে ফিরে গেলেই আমাদের সব সুখ-শান্তি ফিরে আসবে? আর, সত্যি সত্যি কি এযুগের কিশোর-কিশোরীদের নীতিবোধের মূল ভিত্তির সঙ্গে বড়দের নীতিবোধের খুব তফাৎ আছে?

প্রেম ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতা এবং যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধেও আজ অনেক অন্ধ সংস্কার বদলে গেছে। যৌনজ্ঞান সম্পর্কে গোপনতার ষড়যন্ত্র আজ ফাঁস হয়ে গেছে। কোনো কোনো প্রগতিশীল দেশের স্কুলেও ছেলে ও মেয়েদের কিছু কিছু যৌন শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও যৌন প্রক্রিয়ার মূল পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য আজ আলোচনা করা হচ্ছে।

আবার, কোনও দেশে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের যৌন শিক্ষা লাভ করে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে নেমে বিপদ ঘটাচ্ছে, অতএব বেশি যৌনজ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। ডাঃ চেসার মনে করে, এ ধরনের ছেলেমানুষী এক্সপেরিমেন্টকে খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এটা তেমন ক্ষতিকর নয়।

এমন কি, অনেকে অভিযোগ করে থাকেন, শিক্ষকরা স্কুলের ছেলেমেয়ের কাছে জন্মনিরোধক জিনিসপত্র পাচ্ছেন, স্কুলের মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে পড়ার খবর প্রায় শোনা যাচ্ছে। এ থেকে কি বোঝা যায় না যে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতেই চাইছে, দায়িত্বশীল হওয়ার পথেই পা বাড়াতে চাইছে?

আগেকার দিনে ছেলেমেয়েদের কোনরকম যৌনজ্ঞান দেওয়াই হত না। আজও তা যথাযথভাবে দেওয়া হয় না। তার ফলে বিবাহের পরে কত নববধূর জীবনে যে বিভীষিকার অভিজ্ঞতা দেখা দিয়েছে, তার হিসাব নেই। যৌন সম্পর্কের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা হয় তো সারা জীবনভরই তার মনে থেকে গেছে, আর সে বিতৃষ্ণা বিভীষিকা প্রত্যেকবার সন্তান ধারণের ফলে কেবলই বেড়ে চলেছে।

মেয়েরা যৌন জ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করতে না পারার ফলে যৌন বিমুখ হতেই শিখত, আর স্বামীকে তৃপ্তি দিতে না পারার ফলে, স্বামী হত বহির্মুখী। স্বামীকে ত্যাগ করতে পারত না স্ত্রী, কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করত স্বামী।

জন্মনিরোধের পদ্ধতি না জানার ফলে দারিদ্রের চাপে কত মা নিজের সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছে, তিলে তিলে মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিয়েছে।

আজ যদি এসব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাতিমনা তরুণ-তরুণীরা নিজেদের চেষ্টায় যৌন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভের পথ খুঁজতে বেরিয়ে থাকে, তা হলে নীতিবোধের অবনতি ঘটছে বলে ক্ষুব্ধ হওয়ার স্বভাব আমাদের ত্যাগ করার দিন এসেছে বলে ডাঃ চেসার মনে করেন।

জন্মনিরোধের নিয়মকানুন জানার ফলে আজ অনেকেই নিজেদের পরিবারে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কম রাখতে শিখছে। ফলে, সমাজ-স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে।

অনেকের ধারণা, কিশোর-কিশোরীরা অবাধ ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করলে তাদের বিবাহিত জীবনে মিলনের স্থায়িত্ব দৃঢ় হয় না। কিন্তু আমেরিকার ডাঃ কিনসী এবং ইংল্যান্ডের ডাঃ চেসার মানুষের যৌন আচরণের গতি-প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপুল তথ্যানুন্ধান এবং গবেষণা করে দেখেছেন, বিবাহের আগে কিছুটা যৌনসঙ্গমের অভিজ্ঞতা থাকলে নাকি বহুক্ষেত্রে বিবাহ-জীবনের সুখশান্তি বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে।

এমন কথা শুনলে আমাদের দেশের লোকেরা তো চমকে উঠবেই। অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এ আশঙ্কায় আইন-আদালত পর্যন্তও গড়াতে পারে—বিলেত-আমেরিকাতেও বহু লোক এসব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে চান। এতে পরিবর্তিত নীতিবোধের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায় কোনও সুবিধাই হয় না।

যৌন সঙ্গম যে আনন্দ দেয়, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করার জন্য এ আনন্দ থেকে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় নিজেদের বঞ্চিত করে রাখার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

দেহ-মনের বিকাশের প্রয়োজনে যখন যে কোনও কিশোর-কিশোরীর যৌন সম্পর্ক লাভের বাসনা জাগবে, তখন সে অভিজ্ঞতার আনন্দ থেকে নিজেদের স্বভাবতই বঞ্চিত করে রাখতে চায় না। এটা তাদের জীবনের বাস্তব শিক্ষালাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলেই মনে করে।

এ শিক্ষালাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সমাজ কোনও ভাবে সত্যি সত্যি উপকৃত হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে কিশোর-কিশোরীরা বিশেষ সন্দেহ পোষণ করে।

মনোবিজ্ঞান আমাদের যা শিখিয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়–আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা অকারণে বঞ্চিত হয়ে থাকলে সব মানুষেরই মনে হতাশা, বিষাদ, বিদ্রোহ জাগে। তাই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই কিশোর-কিশোরীরা তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার যতখানি সম্ভব তৃপ্তিলাভের সুযোগ্য এবং পথনির্দেশ খুঁজে নিতে চায় এবং সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, তার ব্যবস্থা রাখাই বোধ হয় সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

তাই, কৈশোর পর্যায়ে অপরিণত ছেলেমেয়েদের যৌন চেতনার গতিপ্রকৃতি উপলব্ধির সময়ে সহৃদয়তা নিয়ে ভাবতে হবে, তাদের ব্যাপক যৌনচেতনা এবং যৌন অভিজ্ঞতা লাভের কৌতূহলকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার স্বীকৃত রীতিনীতির আওতার মধ্যেই কতখানি তৃপ্তি দিয়ে সকলের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পদকে সমৃদ্ধ করে সুখী করে তুলতে পারা যায়।

কিশোর-কিশোরীদের কাঁধেই যত দোষ

অন্যের কাঁধে দোষ চাপানো খুব সহজ। তাতে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যার আর সে সঙ্গে ভাল মানুষের সুনাম অর্জন করা যায়। কিশোর-কিশোরীদের যৌন সম্পর্ক চর্চা সম্বন্ধেও এভাবে মানব সমাজের যে পাপবোধ, সেটা অন্যের কাঁধে চাপানোর প্রবণতা স্বাভাবিক। কিশোর-কিশোরীদের কাঁধেই চেপেছে সে দুর্নামের বোঝা।

যে কিশোর-কিশোরীদের নতুন চেতনা জাগছে, নতুন অভিজ্ঞতার কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের সে কৌতূহল দমন করে স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জনের পথ রুদ্ধ করে ভাল মানুষ করে রাখার চেষ্টা চলছে।

যৌন অভিজ্ঞতা অর্জনের কৌতূহলের বশে কিশোর-কিশোরীরা যে দোষ করে ফেলে না, তা নয়। তবে স্কুল-কলেজের মেয়েরা এত বেশি গর্ভবতী হয়ে পড়েছে যে, পড়াশুনো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিংবা হাসপাতালে যৌন রোগীদের জায়গা হচ্ছে না, এসব কথা কেউ বললে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে বলতে হবে। বড়দের ক্ষেত্রেও এমনটা হচ্ছে, সে কথাও মানতে হবে।

তবে, এটা নতুন কিছু নয়। সব যুগেই ছোটরা যেমন সমস্যার সৃষ্টি করে, বড়রাও করে। আজকের দিনে স্বাধীনতার পরিমাণ সবারই হাতে বেশি করে এসেছে। আগের দিনের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারও হয়েছে, নতুন নতুন চিন্তাধারার সংস্পর্শে সকলেই অবাধে আসতে পারছে।

বর্তমানে সমাজে যৌনতা নিয়ে বড়রা যেভাবে আদর্শ সৃষ্টি করছেন, কিশোর-কিশোরীরা সে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে উঠছে। সুতরাং কিশোর সমাজের দোষ-ত্রুটি সমাজই সৃষ্টি করছে, পরিবেশের ত্রুটিই তার জন্য দায়ী।

কিশোর-কিশোরীরা অন্যায় বোধ নিয়েই জন্মায় না, অন্যায় করতে তারা শেখে। আগেকার দিনের মতো সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের রীতিনীতি বড়রা আজকাল ছোটদের শেখাবার কোন চেষ্টাই করেন না–নিজেরাও সাত্ত্বি জীবন ধারা অনুসরণ করেন না।

সুতরাং, ব্রহ্মচর্য পালনে অনভ্যস্ত এযুগের কিশোর-কিশোরীরা যদি যৌন বিষয়ে আজ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এক্সপেরিমেন্ট করতে চায়, সেটা আশ্চর্য নয়। যৌবনের সন্ধিক্ষণে তারা পৌঁছে যায় আজকাল অনেক আগেই। যৌন চেতনার ফলে তারা যৌনাঙ্গ স্বমেহন এবং পরস্পর গভীর গোপন আর-আলিঙ্গনের আকাঙ্খা বোধ করতে থাকে। তবে, সবাই যে যৌন সঙ্গম করে, তা নয়।

যৌন পবিত্রতা সম্পর্কে সহজ চিন্তা

কেবল যৌন সঙ্গমের মধ্যেই যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি ঘটে, এমন কথা আজ আর মনে করার দরকার নেই। কারণ, মানুষের যৌনবোধ শুধুমাত্র যৌন অঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয় বলে জানা গেছে। মানুষের দেহ এত সংবেদনশীল যে, যৌন আকাঙ্ক্ষার শক্তি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যথোপযুক্ত স্পর্শনের মাধ্যমেও তা উপভোগ করা যায়।

এ কারণেই দেহ-মনের সংস্পর্শে কিশোর-কিশোরীরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে যখন পরস্পরের প্রতি খুবই একাত্ম বোধ করে, ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তখন তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব এক সুরে এক তালে অনুরণিত হতে থাকে। দুটি আত্মার মিলনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হতে থাকে।

এ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে গিয়ে কত ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, কতভাবে চেষ্টা-চরিত্র চলতে থাকে। গোড়াতেই অনেক কিছু আশা করে থাকলে, সামান্য ভুলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে হয়। তবে, ভুলেরও মূল্য আছে–তা থেকে শেখা যায়। খুব উঁচুতে হঠাৎ ওঠার চেষ্টা করে যারা, তাদের ভুল হয় বেশি।

যৌন পবিত্রতার আলোচনায় আজকাল একটা নতুন চিন্তার প্রসার ঘটেছে, সেটি হল–সততার প্রয়োজনীয়তা। কিশোর-কিশোরীদের গোপন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে তাদের যৌন আচরণে যখন পরস্পরের প্রতি সুবিবেচনা এবং সততা থাকে, তখন তার মধ্যে অপবিত্রতা কিছুই থাকে না–এ হল ডাঃ চেসারের বিশ্বাস।

এ ধারণার বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করে বলেন, এর ফলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন আচরণের বাঁধ খুলে যাবে। এ বিষয়ে ডাঃ চেসারের রিপোর্টে অকারণ আশঙ্কা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নীতিবোধকে মুছে ফেলার দরকার নেই, কিন্তু তার পরিবর্তন মাঝে মাঝে দরকার হতে পারে।

গোপন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে আজ কিশোর-কিশোরীদের যৌন আচরণের গতি-প্রকৃতি যেভাবে দুঃসাহসিকতার পথ অনুসরণ করে চলেছে, সে ক্ষেত্রে অসঙ্গত কতগুলো বিধিনিষেধ খাড়া করে রাখার চেয়ে সততার ওপর জোর দেওয়া অনেক ভাল–এ পরামর্শই দিয়েছেন ডাঃ চেসার।

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।–একটি কিশোর একটি কিশোরী মেয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল। মেয়েটিকে বলল, সে তাকে খুব ভালবাসে, কারণ এ মিথ্যা কথাটি না বললে যা, চাইছে, তা সে পাবে না। মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করে যৌনমিলনে এগুতেও দিল।

যখন মেয়েটি বুঝল তাকে বোকা বানানো হয়েছে, তখন সব তিক্ততায় পরিণত হল। ছেলেটির কাছে এটা নিছক যৌন ব্যাপার, আরও খারাপ দাঁড়ায় যদি অবাঞ্ছিত সন্তান-সম্ভাবনাও এসে পড়ে। তখন মেয়েটির ওপর কলঙ্ক চাপে–সমাজের এ রকমই ব্যবস্থা। দোষটা ছেলেটিরই হওয়া উচিত, কিন্তু সে সহজেই নিস্তার পেয়ে যায়।

এখন, আর একটি ব্যাপার মনে করা যাক্-ছেলেটি সত্যি কথা বলল এবং মেয়েটিও সব জানল, সে মেনে নিল যে, ছেলেটি শুধুই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইছে–তাকেও আনন্দ দিতে চাইছে, আর সে মতো জন্মনিরোধক সতর্কতাও অবলম্বন করল। তা হলে তাদের দুজনকে কতখানি দোষ দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণ লোকের চোখে তাদের আচরণ হবে সমাজনীতি বিরোধী। কাম চরিতার্থ করার জন্যেই তারা মিলিত হয়েছে বলে নিন্দা করা হবে। তবু বলতে হবে, তাদের দুজনের কেউ বিপদে পড়েনি, দুঃখ বোধ করেনি। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তারা পরস্পর তৃপ্তি সুখ বিনিময় করেছে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। অন্য কোনও লোকেরও ক্ষতি তারা করেনি, সমাজের বোঝাও বাড়ায়নি।

তা হলে, তাদের দোষটা কোথায় হল, কিংবা নীতি বিরোধী কিছু হলই-বা কেমন করে? তা দু'জনে শয্যায় মিলিত না হয়ে সিনেমায় পাশাপাশি বসে মজা করে এলে যেমন কোনও ক্ষতি হত না, এটা তো ঠিক তেমনই হল।

এসব কথায় নীতিবাদী লোকেরা নিঃসন্দেহে আহতই হবেন। কিন্তু ডাঃ অসটেস চেসার মনে করেন, সমাজের যেখানে যেমনটি সব ঠিক রেখে দিয়ে দুটি কিশোর-কিশোরী যদি শুধুমাত্র যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্যেই মাঝেমাঝে মিলিত হওয়াটা জীবনধর্মের অন্তর্গত অন্যতম স্বাভাবিক একটা কাজ বলে মনে করে। তা হলে তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই বোধ হয় দরকার।

এতে বাধাপ্রাপ্ত হলে, কৈশোর জীবনে নব-মুকুলিত মানব সত্তা বিদ্রোহী হয়ে একাধিক নর-নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমের রুদ্ধবেগ অনুভব করতে পারে। তাতে, পাঁচজনের ক্ষতি যদি নাও হয়, তবু তার ফলে ঐ ধরনের বিদ্রোহী কিশোর-কিশোরীদের আবেগ-প্রক্ষোভ ও মানসিক বিকাশ পরিণতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে।

কোনও বিষয়ে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করাটা আমাদের মনোভঙ্গির ওপরেই নির্ভর করে। সে জন্যেই কিশোর বয়সে যৌনসঙ্গমকে অনেকে সর্বদাই নীতিবিরোধী বলবে। কিন্তু ডাঃ চেসারের সহানুভূতিসম্পন্ন অভিমত অনুসারে, একে কোনও কোনও সময়ে সমাজনীতি বিরোধী বলাই ভাল-সব সময়ে নয়।

যেমন, কোনও ছেলে যেন তেন প্রকারের কোনও মেয়েকে প্রলুব্ধ করে যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করলে সেটা স্পষ্টই নীতিবিরোধী। তেমনি, কোনও মেয়ে কেবল মজা করার জন্যে কোনও ছেলেকে মোহগ্রস্ত করে যৌনসুখ উপভোগ করার পরে তাকে বিবাহ করতে যখন বাধ্য করে, তখন সেটাও নীতিবিগর্হিত।

প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং শিশু-কিশোর দরদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেন্‌জামিন স্পক্-ও ডাঃ চেসারের মতোই বলেছেন। বিবাহের আগে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের কৌতূহল সঞ্জাত যৌন আচরণগুলোকে, এমন কি তাদের যৌন সঙ্গমকেও এক কথায় নীতিবিরোধী বা নীতিসঙ্গতও বলে ফেলা যায় না। বিভিন্ন মনের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর ফলে কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিত্ববিকাশ সুষ্ঠু হতেও পারে, ব্যবহত হতেও পারে।

কৈশোরে জন্মতত্ত্ব ও জন্মনিরোধের ধারণা

কৈশোর জীবন পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে শুরু করে কুড়ি-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যে এবং শেষ পর্বে খুবই আবেগপ্রবণ আর প্রাক্ষোভিক ঝড়ঝঞ্ঝার মাধ্যমে তাদের বড় হয়ে উঠতে হয়।

শারীরিক বিকাশ এ মধ্য ও শেষ পর্বে ধীরগতিতে হলেও অব্যাহত থাকে এবং ক্রমশই বয়স্ক মানুষের সব লক্ষণগুলো বিকশিত হয়ে ওঠে।

সামাজিক বিকাশ ক্ষেত্রে তারা বন্ধু-বান্ধবী খুঁজে ফেরে একান্তই আকুলভাবে। বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা কম হলে বেশ মনমরা হয়ে পড়ে।

সে সঙ্গে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন চর্চায় বেশ আগ্রহ-অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়–সব কিছু রহস্যের কার্যকারণ তারা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে জানতে চায় এবং বুঝতে চায়। অভিভাবকরা তাদের এ আগ্রহ দেখে খুশি হন এ ভেবে যে, ছেলেমেয়েরা সত্যিই বড়দের মতো হয়ে উঠছে।

তবে, এ পর্বে বন্ধু-বান্ধবী সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমাজায়িত হয়ে ওঠা আর যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভাবতে শেখে–ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার রহস্য জানতে হবে।

এ মানসিকতার পথ অনুসরণ করেই এ বয়সের কিশোর–কিশোরীরা বড় হতে থাকে এবং সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষদের পর্যায়ভুক্ত হয়েও পড়ে। তখন আর তাদের ছোট ছেলেমেয়ে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলে না মোটেই।

এ পর্বে কিশোর-কিশোরীরা সাহস করে তাদের দেহ-জটিলতা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন অভিভাবকদের উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, যৌনতা এবং যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত তাদের কিছু জিজ্ঞাসাও এসময়ে অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে।

বিশেষ করে, ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি নিয়েও তাদের মনের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব এ পর্বে তারা মিটিয়ে ফেলতে চায় বড়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।

সেটা তো ভালই এবং সে জন্যেই এ পর্বে ছেলেমেয়েদের ওপর সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সহৃদয় পথ নির্দেশ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাতে তারা সহজ স্বচ্ছন্দভাবে এ বয়সের অতি গুরুত্বপূর্ণ যৌনতা বোধের সুস্থ ধারণা নিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে।

অনেক অভিভাবক এ বয়সে ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে অনেক ভাল ভাল পরামর্শ নির্দেশ শুনিয়ে দিয়ে কর্তব্য সাধন করে ফেলতে চান। তাঁরা শুনিয়ে দেন কিছু নীতি কথা, কিছু ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় যে বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে, তার প্রতি সহানুভূতি দিয়ে কিছু উপলব্ধির মনোভাব দেখান না।

এ বয়সটিতে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে বলেই ঘর-সংসারের দু'-একটা কাজকর্মে তাদের লাগতে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বড় হয়ে উঠেছে বলে যখন ছেলেমেয়েরা নিজেরা বন্ধুদের সঙ্গে কোনও জায়গায় যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে শোনে, তারা নাকি এখনও ছোট ছেলেমেয়ে- বড়দের সঙ্গে না নিয়ে ওভাবে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়।

তাই, এ বয়সটা ছেলেমেয়েদের কাছে হয়ে ওঠে দোটানার সময় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর অকারণ বিরক্তির সময়। নানা নতুন সমস্যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিত্যই টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলে রাখে।

এর ফলে কিশোর-কিশোরীরা সহানুভূতির অভাব-বোধ করে এবং আবেগ-প্রক্ষোভ রুদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করে অভিমান-ভরে। ফলে, তাদের আচরণে জাগে নানা রকম বিকার, বিরক্তি আর বিরাগ।

বিশেষ করে, যৌনতা সম্পর্কে তাদের যে সব আবেগ এ বয়সে সৃষ্টি হচ্ছে, সেসব বিষয়ে অভিভাকদের কাছ থেকে কোন পরামর্শই তারা পায় না। যা কিছু পথনির্দেশ পায়, সবই আসে তাদের সমবয়সী অপরিণত-বয়স্ক বন্ধু-বান্ধবীদের কাছ থেকে গোপনে আভাসে।

যদিও কখনও কোনও প্রগতিমনা মা-বাবা তাঁদের ছেলে-মেয়েকে খানিকটা সাহস করে যৌনতা বিষয়ে খোলাখুলি কিছু পরামর্শ দিতে যান, দেখা যায়–সেটা হয় তো অনেক দেরিতে করা হচ্ছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কোথা থেকে এসব তথ্য আগেভাগেই সংগ্রহ করে জেনে ফেলেছে।

মা-বাবা যখন সচকিত হয়ে ওঠেন যে, ছেলে-মেয়েরা খুব বড় হয়ে উঠেছে, এবার তাদের মধ্যে যৌনতা বিষয়ে কিছু, সতর্কতামূলক জ্ঞান সঞ্চার করা বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে, তার অনেক আগেই হয় তো ছেলেমেয়েরা সংগোপনে মৃদু আদর, চুম্বন, আলিঙ্গন, এমন কি, আরও গভীর আদরের পর্যায়ে যৌন অভিজ্ঞতার আস্বাদনও অর্জন করে ফেলেছে। এমনটা প্রায়ই হচ্ছে।

মা-বাবারা ঠিক করতেই পারেন না–এসব বিষয়ে কিভাবে আলোচনা করা যায়। বাচ্চা কোথা থেকে আসে, কেন এবং কোথা থেকেই-বা মেয়েদের মাসিক রজঃস্রাব হয়–এ ধরনের কৌতূহল মেটাতে গেলে, ঠিক কি বলতে হবে, তা মা-বাবারা সত্যিই যথাযথভাবে জানেন না।

এ ধরনের আরও কৌতূহলী প্রশ্ন, যেমন–বিবাহ হলে তবে বাচ্চা হয়, তার আগে হতে পারে না কেন? ছেলেদের লিঙ্গ থেকে যে বীর্যরস বেরিয়ে আসে, ওটা কি?–এ সবই অভিভাবকদের সামনে বিষম বিপত্তির সৃষ্টি করে, কারণ কিভাবে উত্তর দিতে হবে, তা জানা নেই।

নিজের ছেলেমেয়েদের কাছেই যেন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে পরীক্ষায় 'ফেল' করে যান! বাস্তবিকই, মা-বাবার পক্ষে এসব প্রশ্নের আকুলতা মেটাতে না পারা অবশ্যই একটা গুরুতর বিফলতা।

এ রকম বিপাকে পড়ে সব মা-বাবাই স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের মুখোশের আড়াল থেকে অম্লান বদনে বলে দেন, 'আরও বড় হলে জানতে পারবে।' সে 'আরও বড় হওয়া' বুঝি আর ছেলেমেয়েদের এ জীবনে আসে না! আসলে, সে 'বড় হওয়া' অনেক দিন আগেই যে শুরু হয়ে গেছে, নিজের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে মা-বাবা সেদিকে খেয়াল রাখার সুযোগই বুঝি পান না!

কৈশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে সে 'বড় হওয়া' শুরু হয়ে যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে বারো-তের বছর বয়সেই, আর মেয়েদের দশ-এগার বছরেই-ঠিক বয়ঃসন্ধিকাল পর্যায়ের সূচনার আগেই। তখন থেকেই জন্মতত্ত্ব এবং যৌনতা সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসা ছেলেমেয়েদের মনে উঁকি দিতে থাকে। কিন্তু লজ্জাবশে এবং সমাজের প্রচলিত সংস্কারবনে ঐ সব বিষয়ে কোনও প্রশ্ন সহজে তারা মা-বাবার কাছে উত্থাপন করতে পারে না।

তাহলে, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম-মা-বাবা মনে করছেন, এত ছোট বয়সে জন্মরহস্য এবং যৌনতার কথা জানতে না চাওয়াই ভাল আর জানতে চাইলেও কিভাবে সেসব কথা নির্বিকারভাবে ছোটদের উপযোগী করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে হয়, তাঁরা সে কৌশল জানেন না।

আবার, অন্যদিকে, ছেলেমেয়েরা মনে করছে, ছেলেবেলা থেকেই লিঙ্গ এবং যোনি সম্পর্কে মা-বাবারা যে রকম রাখা-ঢাকা করে কথা বলেন, সর্বদা ঐ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখতেই শিখিয়েছেন, তা হলে নিশ্চয়ই ওগুলো সম্পর্কে সব রকম চিন্তাও রেখে-ঢেকে দেওয়াটাই বোধ হয় মা-বাবার মনঃপুত হবে।

এরকম ভাব বিনিময়ের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায় মা-বাবা এবং ছেলেমেয়েদের মাঝে। মন খুলে কোন পক্ষ থেকেই যথাসময়ে এ নিয়ে বিশেষ কোন কথা বলা হয় না।

যদিও-বা এসব বিষয়ে কখনও কোনও কথা ওঠে, তা হলে দেখা যায়, উভয় পক্ষই উপলব্ধি করছে–বিষয়বস্তুটি এমনই যে, উপযুক্ত ভাষা দিয়ে তা বোঝাতে গেলে ঠিক ঠিক শব্দ খুঁজে পেতে বেশ অসুবিধা হয়। ফলে, মা-বাবা যেমন অস্বস্তি বোধ করেন, ঠিক তেমনি, তাঁদের ছেলেমেয়েরাও ভারি লজ্জা পায়, ভয় পায় মা-বাবা কি মনে করবেন তাদের মুখে ঐ সব কথা শুনে।

আমাদের অবশ্য বুঝতে হবে যে, অভিভাবকরা তাঁদের কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের সূচনায় ছোটদের ভাব প্রকাশের দ্বিধায় নিজেরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকেন বলেই এ প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা করে উঠতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা যে জন্মতত্ত্ব বা যৌন তথ্য বিষয়ে একেবারেই আলোচনা কোনও ভাবে করতে চান না, এ রকম নেতিবাচক মনোভঙ্গি বোধ হয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের এ ধরনের আলোচনায় অনীহার একমাত্র কারণ নয়। পরস্পর এ দ্বিধা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় খুবই স্বাভাবিক ভাব বিকাশের লক্ষণ বলতে পারা যায়।

এ ধরনের আলোচনায় শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু রহস্য সম্পর্কে হয় তো তবু খানিকটা স্বচ্ছন্দ মানসিকতা নিয়ে মা-বাবা এবং কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে–যেমন, মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব, জন্মনিরোধ, সন্তান সৃষ্টি কিংবা ছেলেদের স্বপ্নদোষ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃত যৌন আচরণ এবং যৌনতার তাৎপর্য, এ সবের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ততটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়-এ কথা অবশ্য মানতেই হবে।

এসব বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের অনেক প্রশ্ন বহু বিচিত্র জটিল বিষয়কে স্পর্শ করতে থাকে তাদের ক্রমবর্ধমান কৌতূহলের ব্যপ্তি অনুসারে যেমন–কৃত্রিম প্রজনন, অস্ত্রোপচার করে (সীজারিয়ান) শিশুর জন্ম, গর্ভপাত, এমন কি–বিবাহের আগে ছেলেমেয়েদের প্রেম-ভালবাসা, সহকামিতা, বেশ্যাবৃত্তি, যৌন আত্মপীড়ন, নানা প্রকার যৌন আচরণ বিকার এবং যৌন উত্তেজক মাদক চর্চার মতো অতি-সংবেদশীল বিষয় নিয়েও তারা মা-বাবার কাছে প্রশ্ন করে প্রকৃত তথ্য পরিষ্কারভাবে কখনও কখনও জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করে বৈ কী!

বিশেষত, বর্তমান সমাজে বিপুল তথ্য-বিস্ফোরণের যুগে নানাপ্রকার পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, টেলিভিশনের প্রবল প্রভাবে ছেলেমেয়েরা নিত্য নতুন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে এবং স্বভাবতই তার বিশদ পটভূমি জানতে চাইছে।

তবে, এ জাতীয় প্রশ্নচর্চার মধ্যে কিশোর-কিশোরীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের শরীরের নিত্যনতুন সমস্যাদি নিয়েই বেশি তথ্য জেনে নিতে চায় এবং সেটা অবশ্যই সুস্থ মনেরই পরিচায়ক বিবেচনা করে, সে ধরনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যথার্থ তথ্য খুঁজে এনে, যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে সহানুভূতি সহকারে উপস্থাপন করাও প্রত্যেক মা-বাবারই কর্তব্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতেই হবে।

যৌনতা সম্পর্কিত এসব জন্মতত্ত্ব এবং জন্মনিরোধের সব তথ্য ঠিক সময়ে যথাযথভাবে না জানার ফলে বয়ঃসন্ধিকালের দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষতি করে ফেলে নিজেদের জীবনে।

যখন আমরা চোখ খুলে ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করব যে, অবৈধ সন্তান-সম্ভাবনা, গর্ভপাত এবং নানাপ্রকার যৌন ব্যাধি কী পরিমাণে তরুণ সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তখন উপরের কথাটি মানতেই হবে। সে অনুপাতে আজ সারা দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান ঘটনাও কতখানি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে সমাজ সভ্যতার সকল স্তরে, তারও কার্যকারণ উপলব্ধি করা তখন সহজসাধ্য হবে।

দেখাই যাচ্ছে, বর্তমানে স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা এসব ব্যাপারে এখনও যথোচিত সাহস এবং স্পষ্টবাদিতার পরিচয় নিয়ে কিশোর-তরুণ সমাজকে পথনির্দেশ দেবার মতো যোগ্যতা মোটেই অর্জন করতে পারে নি।

এটা শিক্ষাবিদমহলের পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণের চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সব পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষাচর্চার ভূড়ি ভূড়ি প্রমাণ বিধান দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের শারীর-রহস্য জানার এবং বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার মতো কোনও বিশদ পথনির্দেশই পায় না।

সমাজনেতারা বোধ হয়, এ বিষয়টির দায়িত্ব মা-বাবার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে চেয়েছেন, কারণ, মা-বাবারাই স্কুল-কলেজে জন্মতত্ত্ব শিক্ষাদানের কথা শুনলেই 'গেল-গেল' রব তোলেন।

এ যেন গোপনতার এক ঘোর ষড়যন্ত্র চলেছে বড়দের সমাজে। আত্মানুসন্ধানে আকুল ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন মুখ বন্ধ করে রয়েছেন মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই–'জানি কিন্তু বলব না' মনোভাব নিয়ে।

আসলে অনেক অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারই যথাযথ জ্ঞান নেই যৌনতত্ত্ব, জন্মতত্ত্ব এবং জন্মনিরোধতত্ত্ব সম্পর্কে, আর সে কারণেই, তাঁরা 'যখন শেখার বয়স হবে তখন ঠিকই শিখে নেবে এ ভেবে আশ্বস্ত হয়ে ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে উঠতে দেখেও যেন না দেখার ভান দেখান–যেন, ছেলেমেয়েরা সব সময়েই তাঁদের কোলের ছেলেমেয়ে হয়েই রয়েছে।

অবশ্যই, এসব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের আচরণ চর্চার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া দরকার। ছেলেমেয়েরাও জানতে চায়, বুঝতে চায়, কোন্‌টা তারা করবে আর কোন্‌টা করবে না।

তবে, এ কথাও ঠিক, বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের যুক্তি চিন্তা বিকশিত হবার সাথে সাথে, তারা প্রত্যেকটি আচরণ নির্দেশের কারণও ভালভাবে জেনে নিতে চায়। উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীরা তাদের দুরন্ত বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায়ে স্বাধীনতা উপভোগ করে বড় হয়ে উঠতে চায়, যেটা বহুযুগের মানবিক বিকাশেরই সনাতন রীতি।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা ঠিক বুঝতে পারে না–কেন তারা তাদের দেহের মধ্যে অন্য ধরনের এক অনুভূতি উপলব্ধি করছে, কেনই-বা ছেলেরা মেয়েদের দেখলে এবং মেয়েরা ছেলেদের দেখলে অকারণেই সঙ্কোচ বোধ করছে।

তারা তাদের দেহের মধ্যে হরমোন রসক্ষরণের সূচনার খবর জানে না, শারীরিক পরিবর্তনগুলোর সঙ্কেত পেলেও সেগুলো সুস্থতা না অসুস্থতা, তাও ভালভাবে বোঝে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারে, তারা অন্যরকম হয়ে উঠছে।

তারা কিন্তু জানে না যে, তাদের সমবয়সী অন্যদেরও ঠিক ঐরকম উপলব্ধি হচ্ছে, ঐ ধরনেরই সন্দেহাকুল এবং উদ্বেগসঙ্কুল জীবনধারার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠছে, কারণ তারা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে এবং ভাবে–তাদের দেহে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলো সবই অস্বাভাবিক একটা কিছুর লক্ষণ মাত্র।

বড় হয়ে ওঠার এ হল অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পীড়ন এবং এরই মধ্যে দিয়ে কিশোর-কিশোরীরা স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে। 'অভিভাবক' কথাটির প্রকৃত অর্থে বড়রা ছেলেমেয়েদের এ ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তেমন দরদী মন দিয়ে 'ভাবেন' কিনা সন্দেহ।

এসব কারণেই, তাদের উদ্বেগ দুশ্চিন্তার অহরহ বিবেকদংশন থেকে সুস্থিরতার মানসিকতায় উত্তরনের কল্যাণেই সহায়তা করা উচিত। যৌনতা, জন্মতত্ত্ব, নীতি-আদর্শ এবং সঠিক আচার-আচরণ সম্পর্কে তারা ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতেই চায়, তাদের গুঢ় প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর চায়।

এসব তথ্য তারা নিজেদের চেষ্টার এখান-ওখান থেকে খন্ড খন্ড অসম্পূর্ণ এবং অসমর্থিতভাবে জেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা ভাল নয় মোটেই। তারা হয় তো এভাবেই মেলামেশার মাধ্যমে শিখে নিতে পারে যে, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গ চায় শুধুই 'ভাল' লাগে বলে এবং ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গ খোঁজে মূলত 'যৌনতা' চর্চার জন্যে।

এ ধরনের তাত্ত্বিক উপলব্ধি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে জন্মনিরোধের চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে স্বাভাবিক কারণেই। সুতরাং যেভাবে তারা অন্যান্য যৌন তথ্য সমবয়সীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে, সেভাবেই জন্মনিরোধের কিছু বিভ্রান্তিকর অর্ধসত্য কিংবা একেবারেই ভিত্তিহীন পদ্ধতি কৌশল জেনে নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির ভাব পোষণ করতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে এ ধরনের অনেক অবাস্তব চিন্তাধারার মতো জন্মনিরোধের নানা প্রচেষ্টাও বিস্ময়করভাবে সফল কিংবা বিফল হয়ে যেতেও পারে। তাদের কাছে সেটা হবে নিতান্তই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের খেলা, কারণ তাদের কার্যকলাপের সুদূর-প্রসারী সামাজিক পরিণামের জটিল পরম্পরা বিশ্লেষণ করার মতো দূরদৃষ্টি তখনও তাদের অর্জিত হয়নি।

এ কারণেই অভিভাবকরা যদি তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে সহজ স্বচ্ছন্দ আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক জগতে প্রচলিত নানা ধরনের জন্মনিরোধক পদ্ধতির কথা সঠিক তথ্যাদি সহ বুঝিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক যৌন আবেগের তাড়নায় তারা সমাজের দুশ্চিন্তার কারণ না ঘটাতেও পারে।

ডাঃ অসটেস চেসার, ডাঃ বেনজামিন স্পক্, ডাঃ অ্যাল্‌ফ্রেড কিন্‌সী প্রমুখ বিশিষ্ট যৌন-মনোবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সকলেই তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এ যাবৎ যা বলেছেন, তাতে তাঁরা কেবলই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, বর্তমান সমাজে সে সব ছেলেমেয়ে যৌনতা এবং জন্মতত্ত্ব সম্পর্কে মূল তত্ত্বগুলো জেনেছে বুঝেছে, এবং সে সব তত্ত্ব নিয়ে যারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শিখেছে, তারাই তাদের নিজেদের যৌন সম্পর্কিত সমস্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ নিজেরাই যথাযথভাবে করতে পারে এবং যৌন সংযমের প্রকৃত মূল্যবোধ তাদের মধ্যে সেভাবে ঠিকমতো জেগে উঠতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের যৌন আচরণ অভিজ্ঞতার কতগুলো তিক্ত মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত এখানে আলোচনা করলে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা বোধ হয় সহজ হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালের যৌন আবেগ এবং উত্তেজনার তাড়নায় অথবা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনঞ্চার সুলভ আবিষ্কারের উদ্দীপনায়, কিশোর-কিশোরীরা তাদের যৌন-সঙ্গম এবং সন্তান-সম্ভাবনা-এ দুটির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তা জানার সময়ই পায় না।

আজকের দিনে আধুনিকতার এ গর্বোদ্ধত যুগেও তথাকথিত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা যে এমন অসম্পূর্ণ শিক্ষার পরিচয় দিতে পারে, তা চিন্তা করলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বিধায়ক সমস্ত বড়দেরই লজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক।

এ ধরনের অসম্পূর্ণ শিক্ষাদীক্ষার জন্যেই কিশোরী-মেয়ে বোঝে না–কোনও কিশোর বন্ধুর ক্ষণিকের ভাল লাগা আর তাকে বিবাহের জন্য যৌন চর্চা করা–এ দুই আচরণের মধ্যে দায়িত্ববোধের কত আকাশ-পাতাল তফাৎ।

এ সব কেউ তো তাদের আগে থেকে গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে বলে না, পাছে তারা অকালপক্ক হয়ে যায়! কিন্তু তারা যে প্রকৃতির তাড়নায় পরিপক্ক হয়েই উঠতে চায়, কে তাদের ঠেকাবে!

এরকম অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে, বিবাহের আগেই মেয়েদের সন্তান-সম্ভাবনার উদ্বেগজনক ঘটনা সমস্ত মা-বাবাই প্রায়ই শুনে থাকেন, তবুও তাঁদের মেয়েরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও ধারণা করতে পারে না যে, তাদের এ সমাজেই বিবাহের আগে মেয়েরা কিভাবে হঠাৎ সন্তান-সম্ভাবনার দুর্ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে।

পরিবারগোষ্ঠীর প্রধান হয়েও মা-বাবা তাঁদের নিজেদের মেয়েদের সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে কিছুই শিখিয়ে রাখেন না–কেবল কতগুলো অস্পষ্ট আতঙ্কে তাদের যখন-তখন আচ্ছন্ন করে রাখতে চেষ্টা করেন।

ঠিক এভাবেই অনেক ছেলেমেয়েই আজকাল কিছুই জানে না– কিভাবে যৌন অঙ্গের সংযোগ সম্পর্কের মাধ্যমে, এমন কি, যৌনমেহন বা নিতান্ত চুম্বনের মাধমেও যৌন ব্যাধি সংক্রামিত হতে পারে। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে তার বয়ঃসন্ধিকালের পর্যায়ে এ বিষয়ে আভাস দিয়ে রাখা এ কারণেই একান্ত প্রয়োজন।

কিশোর-কিশোরীরা যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে, মা-বাবারাও যদি আগ্রহ দেখিয়ে সময় সুযোগ করে সে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, তা হলে, ছেলেমেয়েরা যেমন খুব উৎসাহ পায়, তেমনি পারিবারিক সংহতি এবং একাত্ম বোধের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার প্রান্তসীমা নির্ণয় সম্পর্কেও সময় মতো সতর্ক সচেতন করে দেওয়া খুবই স্বচ্ছন্দে সহজসাধ্য হয়।

জন্মতত্ত্ব চর্চা

একটা গুরুত্বপূর্ণ কৈশোর মানসিকতা এ যৌনতা এবং জন্মতত্ত্ব সম্পর্কে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হল এ যে, ছেলেমেয়েরা পারস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্কের সম্ভাবনা কল্পনা করলে তারা সুস্পষ্টভাবে জানতে চায় সে ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টির উপযোগিতা কতখানি।

সব সময়েই যে তারা নিছক আনন্দ তৃপ্তি উপভোগ কিংবা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের আকর্ষণে মিলিত হতে চায়, তা ঠিক নয়। তাদের যুক্তিবোধ ইতিমধ্যে ভালই জেগেছে, যৌন মিলনের অর্থ খানিকটা বুঝেছে, অতএব তারা এ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা পক্ষে যোগ্যতা অর্জন করেছে বলেই মানতে হবে।

তাদের যদি সুস্পষ্টভাবে বোঝানো যায় যৌন মিলন না করলে কি উপকার হবে, তা হলে তারা সে গোপন চর্চা থেকে নিবৃত্ত হবার যুক্তিসঙ্গত মানসিকতা অবশ্যই অর্জন করতে পারে।

এমন কি, তাদের যদি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে বলা হয় যৌন মিলন করার আগে কি ধরনের দায়িত্ব সম্পর্কে সমস্ত ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়, তা হলেও তারা সে চর্চার আগে আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এসব আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল এ যে, কিশোর-কিশোরীরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যৌন মিলন মানেই সন্তান সৃষ্টি, তা হলে তাদের দায়িত্ব জ্ঞান বিকশিত হবেই।

এ কারণেই, তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার– কিভাবে যৌন মিলনের ফলে একটি ছেলের বীর্যরসের মাধ্যমে তার দেহ থেকে শুক্রবীজ একটি মেয়ের যোনিপথ দিয়ে তার জরায়ু মধ্যে উপনীত হয়ে সন্তান সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটায়।

জন্মতত্ত্বের এ সহজ সরল পদ্ধতিটুকু ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের আগেই জানাতে পারলে ভাল হয়। এ আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকলে তারা যৌন সঙ্গমে এক্সপেরিমেন্ট বা দুঃসাহস করার আগে অনেক চিন্তা করবেই।

সুতরাং যারা বিবাহ না করে সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের পক্ষে সন্তান পালনের দায়িত্ব এলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তারা একই জায়গায় থাকে না বলে সন্তানের দায়িত্ব কেবলমাত্র মেয়ের ওপরেই থেকে যায়। সমাজে সে দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না। যে ছেলে বিবাহের আগে এভাবে সন্তানের জন্ম দেয়, তাকে সমাজে সকলে নিন্দা করে, দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে।

যৌনসঙ্গম ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি

আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জন্মতত্ত্ব বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া উচিত, সেটি হল–যৌন মিলন ছাড়াও সন্তান-সম্ভাবনা হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সত্যিই হয়েছে।

তাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, কোনও ছেলের লিঙ্গ থেকে যে বীর্যরস বার হয়, তার মধ্যে শুক্রবীজ থাকে ছোট ছোট ব্যাঙাচির মতো অতি ক্ষুদ্র আকারে এবং সেগুলো নিজের প্রাণশক্তিতেই পুচ্ছ নাড়তে নাড়তে তীব্রবেগে মেয়ের যোনিপথ বেয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

যদি কখনও কোনও ছেলে অনাবৃত দেহে গভীরভাবে আদরের সময়ে কোনও মেয়ের যৌনাঙ্গের ওপর তার লিঙ্গ ঘর্ষণ-মর্দনের মাধ্যমে মেয়েটির অনাবৃত যোনিমুখের কাছে তার বীর্যপাত করে, তা হলে ছেলেটির লিঙ্গ ঐ মেয়েটির যোনিপথের মধ্যে প্রবেশ না করলেও অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যৌন সঙ্গম না হলেও, অনেক সময়ে কিছুটা বীর্যরসের ধারা যোনিপথের ভিতরে গড়িয়ে চলে যেতে পারে এবং সে রসধারা বেয়ে শুক্রাণুগুলোও ছুটতে থাকে যোনিপথ ধরে মেয়েটির জরায়ু অভিমুখে। সে সময়ে যোনিপথের মাঝে ফ্যালোপিয়ান নালিকার মধ্যেই মেয়েটির ডিম্বাণুর সাথে কোনও একটি শুক্রাণু মিলিত হয়ে সন্তান-সম্ভাবনা ঘটাতে পারে খুবই।

সন্তান সম্ভাবনার লক্ষণ

কিশোরী মেয়েদের এ কথাও জানিয়ে রাখা ভাল যে, কোনও ছেলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হবার পরে যদি কোনও মাসে তার নিজের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হতে দেখা যায়, তা হলে সেটাকেই সন্তান-সম্ভাবনার প্রাথমিক লক্ষণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া, মেয়েদের দেহে সন্তান সৃষ্টি শুরু হলে, স্তনদেশে ভারী বোধ হয় এবং স্তনবৃন্ত দুটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। অনেক সন্তানসম্ভবা মেয়েরই সকালবেলা বেশ অস্বস্তি বোধ হয়। অনেকের পেটের গোলমাল হয় এবং বমিভাব দেখা যায়। প্রথম দেড়-দু'মাস এ লক্ষণগুলো দেখা দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, মেয়েটি সন্তানধারণ করছে।

১. ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বাণু নির্গত হয়।
২. শুক্রাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে।
৩. ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু ফ্যালোপিয়ান নালীর মধ্যে মিলিত হয়।
৪. শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে।
৫. নালী মধ্যে ডিম্বাণুর ভ্রূণায়ন ঘটে শুক্রাণুর সাহায্যে।
৬. ভ্রূণায়িত ডিম্বাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং জরায়ু গাত্রে আশ্রয় নেয়।
৭. ডিম্বাণুর বিভাজন হতে থাকে এবং সন্তান সৃষ্টি হয়।
৮. জরায়ু গাত্রে সন্তান পুষ্টিলাভ করতে থাকে।

চিত্র-৮ সন্তান-ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

মেয়েদের দেহে সন্তানের সৃষ্টি হলে খাওয়ার আগ্রহ বদলে যায় এবং বারে বারে অল্প অল্প খাওয়ার ইচ্ছা হতে থাকে। মাঝে মাঝে বিশেষ কোনও খাবার খেতে মন চায়। সে সঙ্গে বেড়ে যায় ঘুমের পরিমাণ।

এসব লক্ষণ প্রকাশ পেলে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা করানো ভাল। বিগত মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার দিন থেকে ৪০ দিনের পরের দিনটিতে মূত্র পরীক্ষা করালে তাতে সন্তান ভ্রূণ-সৃষ্টি সম্পর্কিত হরমোন রসের নির্দশন পাওয়া যেতে পারে। সে উদ্দেশ্যে মেয়েদের কোনও গভীর যৌন আচরণের পর কোনও রকম অস্বস্তি বা অসুস্থতা বোধ হলেই প্রেগনস্টিকন পরীক্ষা করানো ভাল।

রজঃবন্ধ

সন্তান ধারণ কালে যে ঋতুবন্ধ হয়ে থাকে, সেটা কোন রকম রোগ নয়। তবে প্রথম ঋতুদর্শনের পর কোনও মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাব রীতিমতো না হয়ে হঠাৎ কিংবা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেলে যে দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাকে রজঃবন্ধ (অ্যামেনোরিয়া) রোগ বলা যেতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুবিধার জন্য এ ব্যাধিটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. মুখ্য রজঃবন্ধ (প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া)
২. গৌণ " সেকেনডারি "
৩. প্রাদাহিক " (ইনফ্লেমেটারি)
৪. অপ্রাদাহিক " (এসথেনিক ") ইত্যাদি

মুখ্য রজঃবন্ধ ব্যাধিতে জরায়ু অঞ্চলে ব্যথা হয়, ক্ষুধামন্দ্য, বমি এবং বমিভাব, ঢেঁকুর, কৌষ্ঠবদ্ধতা, স্তনে ব্যথা, হৃদকম্পন, শ্বাসকষ্ট, কান ভোঁ ভোঁ, তন্দ্রাভাব, অনিদ্রা, স্বপ্নদেখা, পেটের অসুখ, এমন কি মুর্ছা রোগ পর্যন্তও দেখা দেয়।

গৌণ রজঃবন্ধ ব্যাধি হলে তলপেটে ব্যথা হয়, জরায়ু জ্বালা করে, দেহের নানা স্থানে ফুলে ওঠে, মনোবিকার লক্ষ্য করা যায়, গলার স্বর ভেঙ্গে যায়, কান ভোঁ ভোঁ করে, নাক, স্তন বা দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পাত হয়।

ঠাণ্ডা লাগলে, কাজ কর্মের ধারা হঠাৎ বদলে গেলে, অত্যধিক পরিশ্রম, অলসতা, রাগ, দুঃখ, রোগ, শোক, রক্তহীনতা, উত্তেজক খাবার দাবার, দীর্ঘ ভ্রমণ–এসব কারণে মেয়েদের মুখ্য রজঃবন্ধ হতে পারে। এ ছাড়া ভগচ্ছদ ছিন্ন হয়ে গেলেও রজঃবন্ধ হতে পারে। অনেক সময়ে স্বল্প ঋতুস্রাব হলে ভগৌষ্ঠে শ্লেষ্মার মতো পদার্থ জমা হয়ে জরায়ুর মুখ জুড়ে গিয়েও মুখ্য রজঃবন্ধ হতে পারে।

কোনও মারাত্মক অর্বুদ (টিউমার) কিংবা কর্কট (ক্যানসার) রোগের ফলেও গৌণ বজঃবন্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং লক্ষণ বুঝে দ্রুত চিকিৎসা না করালে চিরতরে মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে। অন্যান্য নানা প্রকার কঠিন রোগের পরিণামেও রজঃবন্ধ হয় বলে জানা যায়।

মনে রাখতে হবে, রজঃবন্ধ হল অন্যান্য কোনও উৎকট ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। সুতরাং যে সব লক্ষণ বর্ণনা করা হল, সেগুলো বিচার করে যদি বোঝা যায় যে, অন্য কোনও দূরারোগ্য ব্যাধির জন্যই রজঃবন্ধ হয়েছে–গর্ভসঞ্চারের জন্য নয়–তা হলে সে মতো চিকিৎসার প্রয়োজন।

কিভাবে সন্তান জন্মে

পুরুষ এবং নারীর শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু পরস্পর মিলিত হলে সন্তান ভ্রূণ জন্মায়– এ রহস্য প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকেই জানিয়ে রাখা ভাল। তা হলে, তারা বুঝবে, তারা এক অতি দায়িত্বপূর্ণ জীবন পর্যায়ে পৌঁছতে চলেছে।

এ দায়িত্বজ্ঞান সৃষ্টি হলে তাদের আত্মমর্যাদা বিকাশের পক্ষে যেমন বিশেষ সহায়ক হবে, তেমনি নিছক খেলার ছলে যৌনচর্চার স্বভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতেও পারবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নির্দিধায় তাদের জানাতে হবে যে, প্রথমে শুক্রাণু (পুরুষ বীজ) প্রবেশ করানো হয় যোনিপথে। সে শুক্রাণু আসে পুরুষের যৌনগ্রন্থি (শুক্রাশয়) থেকে লিঙ্গ নালীর মধ্যে দিয়ে। পুরুষের লিঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু নারীর যোনিপথের মাধ্যমে ডিম্বকোষের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চলতে শুরু করে। একেই ভলা হয় যৌন সঙ্গম বা যৌন মিলন। এটা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সে জন্যই যথেষ্ট বয়েস হলে বিবাহের পরে এর অধিকার পায় ছেলেমেয়েরা।

এভাবে ছেলেমেয়েদের জন্মতত্ত্বের মূল গুরুত্ব বোঝানোর পরে তাদের জানানো দরকার যে, মহিলার দেহের মধ্যে ডিম্বকোষ থেকে একটি ডিম্ব ফ্যালোপিয়ান নালিকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে জরায়ুর দিকে। যোনিপথে শুক্রাণু ছাড়া হলে, সেগুলো জরায়ুর দিকে উঠতে থাকে তাদের পুচ্ছ নাড়াতে নাড়াতে এবং যেখানে ডিম্বাণুটিকে পায়, সেখানেই একটি শুক্রাণু সে ডিম্বাণুটিতে প্রবেশ করে। এ মিলন বা নিষেক সাধারণত ঘটে থাকে ফ্যালোপিয়ান নালিকার (টিউবের) মধ্যে –মাঝ বরাবর।

লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু যোনিপথে ছাড়া হলেও সেগুলোর মধ্যে থেকে ঐ একটি মাত্র শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুটির আবরণে এমন এক বিশেষ রহস্য ঘন পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে আর কোনও শুক্রাণু তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

সে শুক্রাণু-নিষিক্ত ডিম্বাণুটি তখন আগের মতোই জরায়ুর দিকে এগিয়ে চলতে থাকে এবং জরায়ুর মধ্য প্রবেশ করে সেটির গায়ে রক্ত দিয়ে যে আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে আটকে যায়।

সে খানেই সেটি ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে এবং বিকশিত হতে থাকে ন'মাস ধরে। সে কয়দিন হল সন্তান ধারণের পর্যায়। তারপরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় আসে এবং প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে করতে তীব্র প্রসব বেদনা জাগিয়ে একদিন যোনিপথ স্ফীত করে সন্তানের মাথাটি প্রথমে বেরিয়ে আসে। তখন শিশুটি মায়ের জরায়ু বা জঠরগাত্রে একটি পুষ্টিসংবাহী নালিকা দিয়ে সংযুক্ত থাকে। সে নালিকা কেটে তার দু'দিকে মুখ শক্ত করে বেঁধে দেবার পরে সন্তানের জন্ম সম্পূর্ণ হয়।

সীজারিয়ান জন্ম

কোনও কারণে যদি মায়ের তলপেটে অস্ত্রোপচার করে সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করাতে হয়, তা হলে তাকে সীজারিয়ান জন্ম বলে। তলপেটের নিচের অংশটুকু এবং জরায়ু গাত্রে অস্ত্রোপচার করে দরজার মতো খুলে ফেলা হয়। তখন সেখান দিয়ে সন্তানটিকে সরাসরি দ্রুত বার করে আনা হয়। যোনিপথ দিয়ে সন্তান জন্মের কোনও অসুবিধা থাকলে এ সীজারিয়ান অস্ত্রাপচারের সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।

যদি শিশুর আকৃতি বেশ বড় হয় কিংবা সঠিক স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে জরায়ুর মধ্যে শিশুটি না থাকে,–সন্তান ধারণকালে মায়ের চলাফেরা ধীর স্থির না হলে, বাসে ট্যাকসীতে নৌকায় রিকশায় চেপে ঝাঁকুনি লাগলে, জরায়ুর মধ্যে শিশুর অবস্থান উলটে যেতে পারে, অথবা মায়ের শারীরিক অবস্থা এমনি দুর্বল যে, স্বাভাবিকভাবে যোনিপথের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করতে হলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে সীজারিয়ান অপারেশন করাতেই হয়।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কৃপায় এ অস্ত্রোপচার কোন রকম বিপজ্জনক ব্যাপার নয় এবং বহু মহিলা এ পদ্ধতিতে সুস্থ সন্তান লাভ করে থাকেন।

এ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম সন্তাটির জন্ম হয়েছিল সম্রাট জুলীয়াস সীজারের আমলে, তাই নাকি এ নাম। এভাবে শিশুর জন্ম হলে, তাকেও বলা হয় সীজারিয়ান শিশু।

যমজ শিশুর জন্ম

যখন একই সাথে দৈবক্রমে নারীদেহের দুটি ডিম্বাণুর সঙ্গে দুটি শুক্রাণু নিষিক্ত হয়ে যায়, কিংবা একই ডিম্বাণু টুকরো হয়ে দুটি অণু ডিম্বাণু হয়ে যায়, তখন যমজ শিশুর সৃষ্টি হয়। দুটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে যমজ শিশুই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মায়। যমজ শিশু দুটিই ছেলে অথবা মেয়ে হতে পারে, আবার একটি ছেলে আর একটি মেয়েও হতে পারে। তাদের দুজনের মধ্যেই হুবহু সাদৃশ্য থাকে।

যদি একটি ডিম্বাণু থেকে যমজ শিশু জন্মায়, তা হলে দুজনেই ছেলে কিংবা মেয়ে হবে এবং একই রকম দেখতে হবে, এমন কি, তাদের মানসিকতাও হবে আশ্চর্য রকম একই ধরনের।

কৃত্রিম প্রজনন

লিঙ্গ-যোনি সঙ্গম না করেই পুরুষের শুক্রাণু সমেত কিছুটা বীর্যরস যান্ত্রিক কলাকৌশলের মাধ্যমে নারীর যোনির মধ্যে কিংবা জঠরে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে বলে কৃত্রিম প্রজনন। যদি বিবাহিত পুরুষের কোনও অসুস্থতার জন্য যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে যৌন সঙ্গম করা এবং চরম পুলকের মাধ্যমে বীর্যরস নিক্ষেপ করা কোনও ক্ষেত্রে একান্তই অসম্ভব হয়, তখন এ পদ্ধতিতে পুরুষের বীর্যরসের মাধ্যমে স্ত্রীর দেহে কৃত্রিম প্রজনন করানো যেতে পারে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের যৌন তৃপ্তির কোনই সম্ভাবনা নেই।

নলজাতক শিশু

যদি কখনও কোনও মহিলার ফ্যালোপিয়ান নালিকার মধ্যে কোনও কারণে শারীরিক স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে সন্তান সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব হয়। তখন তার ডিম্বকোষ থেকে যান্ত্রিক কলাকৌশলের মাধ্যমে একটি ডিম্বাণু নিষ্কাশন করে বাইরে আনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি একটি কাঁচের নিরীক্ষা নল বা টেস্ট টিউবের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষণের সব রকম সুব্যবস্থা করা হয়।

এর পরে সে নলটির মধ্যে পুরুষের শুক্রাণু সমেত বীর্যরস মিশিয়ে দিয়ে ভ্রূণ সৃষ্টির আয়োজন করা হয়। ঐ নিরীক্ষা-নলটির মধ্যেই প্রকৃতির নিয়মে ধীরে ধীরে যথাসময়ে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়ে যায়।

তারপর সেটিকে বিশেষ একটি যন্ত্রের সাহায্যে মহিলাটির জরায়ুর মধ্যে খুব সাবধানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই ভ্রূণটি প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণ আকৃতির এক শিশুতে পরিণত হতে থাকে।

যেহেতু, নিরীক্ষা-নলের মধ্যে শিশুটির জন্মের প্রাথমিক ভ্রূণটি সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে কারণেই এ ধরনের শিশুর জন্মকে নলজাতক বলা হয়। আধুনিক যুগের ইতিহাসে, এভাবে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নলজাতক শিশুর জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এখন পৃথিবীর প্রায় দেশেই হচ্ছে।

জন্মনিরোধ

যৌন মিলনের ফলেই সন্তানের জন্ম হয়, এ তথ্য কিশোর-কিশোরীরা জানার পরে, একথাও তাদের জানা দরকার–কি ভাবে মানুষ ইচ্ছা করলে এ জন্ম নিরোধ করতেও পারে। এ ব্যাপারে নানা রকম পদ্ধতি আছে–প্রকৃতিগত এবং কৌশলগত।

নিরাপদ সময়

প্রকৃতিগত পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ করতে চাইলে নিরাপদ সময়ে যৌন সঙ্গমের নিখুঁত পরিকল্পনা করতে হয়। নিরাপদ সময় বলতে বোঝায় সে সময়, যখন নারীর ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বাণু বের হয়নি বলে হিসাব করে জানা যাবে।

কোনও নারীর মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো মাস ছয়েক যাবৎ লক্ষ্য করলে জানা যায়, কখন ডিম্বাণু বেরিয়ে আসে, কারণ তখনই ঋতুস্রাব শুরু হয়। তাই, মাসিক ঋতুস্রাবের আগের এবং পরের পাঁচ দিন করে সতর্কতামূলক বাড়তি হিসাবে বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলোকে নিরাপদ সময় বলা যেতে পারে। কারণ তখন ফ্যালোপিয়ান টিউবে ডিম্বাণু নেমে আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এ পদ্ধতি মেনে চলতে হলে নারী-পুরুষ উভয়কেই খুব সংযমী ও সতর্ক হতে হয়। অনেক দিন ধরে সযত্নে হিসেব রাখতে হয়। প্রতি মাসে ঋতুস্রাব শেষে মাত্র পাঁচ দিনই সম্পূর্ণ নিরাপদে যৌন সঙ্গম করা চলে। সেটাই অবশ্য গার্হস্থ্য ধর্মশ্রিম অনুযায়ী বৈদিক সনাতন সাত্ত্বিক পদ্ধতি। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট মাত্র পাঁচ দিন যৌন সঙ্গমের অধিকারে সন্তুষ্ট না হবার ফলে, এ পদ্ধতি অনেকের পক্ষেই আজকাল মেনে চলার ইচ্ছা হয় না।

কনডোম ঃ এটি একটি কৌশলগত পদ্ধতি। পাতলা অথচ মজবুত নরম রবারের একটি খাপ দিয়ে পুরুষের লিঙ্গটি ডেকে নিয়ে যৌন সঙ্গম করা হয়। ফলে, বীর্যরস বেরিয়ে সেটির মধ্যেই জমা হয়ে থাকে এবং নারীর যোনিতে প্রবেশ করতে পারে না বলে ডিম্বাণুর সাথে মিলতেও পারে না। এ পদ্ধতিটাই ইদানীং সহজলভ্য হয়েছে,কারণ অনায়াসসাধ্য এবং খরচ কম।

ক্রীম ঃ শুক্রাণুনাশক এক ধরনের ডাক্তারী ক্রীম কনডোমের মধ্যে দিয়ে রাখলে শুক্রাণুগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে আরও নিরাপদ হওয়া যায়। এছাড়া, এক ধরনের পিচকারীর সাহায্যে ঐ ক্রীম নারীর যোনির একেবারে ভেতরে জরায়ুর মুখে খানিকটা দিয়ে দিলে, যদি সেখানে কিছুমাত্র বীর্যরসও কোনও ভাবে গিয়ে পড়ে, তা হলে সেটি নষ্ট হয়ে গিয়ে জন্মনিরোধের কাজ সফল করে।

বড়ি ঃ মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হবার চৌদ্দ দিন আগে ডিম্বকোষ থেকে একটি ডিম্বাণু নেমে আসা শুরু করে। ডিম্বাণু নেমে আসার আনুমানিক দশ দিন আগে এবং দশ দিন পর অবধি প্রতিদিন যদি জন্মনিরোধক বড়ি (পিল) খাওয়া হয়, তা হলে ডিম্বাণুর নেমে আসার কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, জন্ম নিরোধ সার্থক করা যায়। তখন যৌন সঙ্গম করা হলেও সন্তান সম্ভাবনা না হতেও পারে।

১৯৫০ সালে এ 'পিল' জন্মনিরোধক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। তবে দেখা গেছে, যথাসময়ে ঐ বড়ি নিয়মিত খেতে ভুলে যাওয়ার ফলে গর্ভসঞ্চার হয়ে গেছে। যে মহিলা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটিও বড়ি খেতে ভুলে যান না, এমন ক্ষেত্রেও গর্ভসঞ্চার হতে দেখা গেছে। তার কারণ সম্ভবত এ যে, ওষুধের বিরুপ কোনও রকম সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া থেকে অনেকে নিজেকে রক্ষা করার চিন্তায় কম করে বড়ি খেয়ে থাকেন, তাই ফল হয় না।

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২০ রকম জন্মনিরোধক বড়ি প্রচলিত আছে। এসব বড়িতে থাকে বিভিন্ন হরমোন যেগুলো ভ্রূণায়নে বিঘ্ন ঘটায়– ডিম্বকোষ নির্গমণ হয় না, তবে ঐ সব হরমোনগুলোর প্রস্তুত প্রণালী হয় বিভিন্ন ধরনের, সে কারণে কোন্ বড়ির কেমন প্রতিক্রিয়া হবে, তা বলা কঠিন।

জন্মনিরোধক বড়ির অবাঞ্ছিত কি কি হতে পারে, তা নিয়ে এখনও সর্বত্র বিশেষ গবেষণা-নিরীক্ষা চলেছে। সে জন্য এ বড়ি সম্পর্কে দু-এক বছর আগেও যা ভাবা যেত, এখন অনেক ক্ষেত্রেই তা আর ভাবা যায় না। এ বড়ির জন্মনিরোধক প্রভাবের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা এ–

কর্কট (ক্যানসার) রোগের সম্ভাবনা ঃ বমিভাব, মাথাধরা, যোনিতে সামান্য রক্তপাত, কিছুটা মোটা হয়ে যাওয়া–এসব লক্ষণ কোনও কোনও মহিলার ক্ষেত্রে দেখা গেলেও তা কয়েক দিনের মধ্যেই আপনা হতে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

মনোবিকার ঃ কোনও কোনও মহিলা অভিযোগ করে থাকেন যে, জন্মনিরোধক বড়ি খেলে প্রথম দিকে অবসাদ জাগে, তবে এটা যে বড়ির জন্যেই হয়, তা বলা কঠিন। অবশ্য এমনও দেখা গেছে যে, বড়ি খাওয়ার ফলে অনেক মেয়ে আগের চেয়ে ভাল বোধ করে থাকে।

পুষ্টিবিকাশের ক্ষতি ঃ অনেকে বলে থাকেন, জন্মনিরোধক বড়ি খেলে যকৃতের নাকি ক্ষতি হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এ যে, অনেক মহিলা এ বড়ি ব্যবহারের পরে তাঁদের বহুমূত্র রোগের পূর্বলক্ষণাদি প্রকটিত হয়েছে। বড়ি খাওয়া বন্ধ করলে তাঁদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আবার ফিরে পেয়েছেন।

রক্তজমা (থ্রম্বসিস) ঃ জন্মনিরোধক বড়ির এ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেই আধুনিককালে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও এ সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলে থাকেন যে, এ বড়ি জন্মনিরোধের উদ্দেশ্যে জরায়ু প্রদেশের শিরায় রক্ত জমাট করার যে প্রক্রিয়াটি সাধন করে, সে প্রক্রিয়ার পরিণামে জমাট রক্ত যদি কোনও ক্রমে ফুসফুসে বাহিত হয়ে যায়, তা হলে বুকে যন্ত্রণা শুরু হতে পারে, কাশিতেও রক্ত বেরুতে পারে। বিশেজ্ঞরা সকলেই এ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন।

এ সম্ভাবনার ঝুঁকি অবশ্য কতটা, তা নিয়ে সকলেই নানা অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। তবে একজন মহিলাকে সারা জীবন জন্মনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে, তাঁকে প্রায় ২৫/৩০ বছর একাদিক্রমে ঐ বড়ি খেয়েই চলতে হবে–সেটা অনেকের মনঃপুত নয়।

এছাড়া, আরও নানা রকমের কলা কৌশল প্রচলিত আছে জন্মনিরোধের উদ্দেশ্যে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে, এ পদ্ধতিগুলোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়ে থাকে, কারণ এগুলো মেনে চলা অনেক সহজ।

তবে, সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, জন্মনিরোধের কোন পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয় বলে বাস্তবক্ষেত্রে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দেখা গেছে, কনডোম, ক্রীম বা বড়ি ব্যবহার করা সত্ত্বেও দৈবক্রমে নানা কারণে সামান্য অসতর্কতার ফাঁকে সে পদ্ধতি বিফল হয়ে গেছে এবং সন্তান সম্ভাবনা ঘটে গেছে। এ জন্যেই এদেশের প্রায় সকলেই জানে, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিনটি ঘটনা মানুষ কখনই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

লূপ ঃ এটি এক ধরনের ছোট্ট প্লাসটিক, নাইলন, অথবা স্টেনলেস স্টীলের আংটা, ধনুক বা পেঁচানো সূতোর মতো কৌশল, যার বৈজ্ঞানিক নাম হল ইনট্রা ইয়ুটেরাল (কনট্রাসেপটিভ) ডিভাইস বা আই. ইউ. (সি.) ডি.। অনেক দেশে একে বলে কয়েল, অর্থাৎ পাকানো তারের মতো। হাসপাতালে অভিজ্ঞ সেবিকা সরবৎ খাওয়ার নলের মতো এক ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে হাতে করে নারীর যোনির মধ্যে এটিকে লাগিয়ে দেন। এ কৃত্রিম জিনিসটি যোনির মধ্যে থাকার ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার জন্য সন্তান সম্ভাবনা অর্থাৎ ভ্রূণায়ন হয় না।

কেন যে লূপ জিনিসটি ভ্রূণায়নে বিঘ্ন ঘটায়, তা সঠিক বোঝা যায় না। লূপ ব্যবহার করলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঠিকমত পরাতে না পারলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে অনেকের অস্বস্তি হতে পারে। তখন হাসপাতালে গিয়ে অনায়াসে কোনও সেবিকার সাহায্য নিয়ে তা খুলিয়ে ফেলা যায়। তবে এ পদ্ধতি বেশ নির্ভরযোগ্য বলে কার্যক্ষেত্রে বিশেষভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

শুক্রনালী ছেদন (ভ্যাসেকটমি) ঃ এটি পুরুষের শুক্রাণুবাহী নালী (বাস ডেফারেন্‌স্‌) অপারেশনের একটি সহজ পদ্ধতি। এ নালী দিয়েই শুক্রকোষ থেকে শুক্রাণু চলে আসে লিঙ্গে। ভ্যাসেকটমি অস্ত্রোপচার করে ঐ নালীটি শক্ত করে বেঁধে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ইচ্ছা করলে ঐ বাঁধন খুলে দিয়ে আবার শুক্র চলাচল শুরু করানো যায়।

ডিম্বনালী ছেদন (লাইগেশন) ঃ এটিও খুব সহজ অস্ত্রোপচার পদ্ধতি। যখন কোনও মেয়ের গুরুতর অসুস্থতার জন্য সন্তান ধারণ অনুচিত বলে বিবেচিত হয়, তখন স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই সম্মতি নিয়ে একটি সন্তান জন্মের ঠিক পরেই ডিম্বাণুবাহী নালীটি বেঁধে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গর্ভপাত ঃ নারীগর্ভের ভ্রূণটিকে বার করে নষ্ট করে ফেলার এ অমানুষিক পদ্ধতি কেউই বড় একটা পছন্দ করে না সারা দুনিয়াতে। তবে কোনও ব্যাধিগ্রস্ত নারীর এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, যেমন অবিবাহিত গর্ভধারিনীর অনেক সময় বিশেষজ্ঞের সাহায্যে, আইনের সমর্থনে এ গর্হিত কাজটি বাধ্য হয়েই করতে হয়।

জন্মনিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ঃ

যথেচ্ছাভাবে যেমন-তেমন করে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা কাজে লাগালে তার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে খারাপ হতে পারে প্রত্যেকটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই। কারণ এগুলো সবই প্রকৃতি বিরোধী আচরণ। এক-একজনের ক্ষেত্রে এর এক-এক রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সে কারণে, কোনও জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরে, অস্বস্থিবোধ করলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া খুবই দরকার।

জন্মরহস্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ জ্ঞান সত্যিই ছেলেমেয়েদের ভালভাবেই থাকা দরকার। কারণ, কানাঘুসো কথার মধ্যে থেকে টুকরো টুকরো কথা জেনে সেগুলো জুড়ে নিয়ে যে-জ্ঞান সঞ্চয় করে অধিকাংশ মেয়ে বাস্তব জীবনে সন্তান-জন্মদানের সঙ্কটাকীর্ণ দুরুহ ব্রতপালনে এগিয়ে যায়, তার পরিণাম হয় অনেক ক্ষেত্রেই বেদনাময় করুণ।

যখনই কোনো বিভ্রাট ঘটে যায়, সঙ্কট ঘনিয়ে আসে, তখন তো সবাই অনেক কথা বলতে শুরু করে দেন– 'এটা করা ঠিক হয়নি', 'এরকম করা উচিত ছিল', 'আমাদের সময় আমরা এরকম করতাম'। এসব শুনতে শুনতে তরুণী বেচারীর ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সাধারণত এ ব্যাপারে যতটা ব্যথা-বেদনার ঝুঁকি থাকে, তার বেলায় বুঝি খুব বেশি খারাপই হচ্ছে।

গোড়া থেকেই তাকে শেখাতে হবে যে, সন্তানধারণ খুব সাধারণ যৌন জীবনেরই অঙ্গ-যদিও অনেককে সন্তান ছাড়াও অন্য কোনোভাবে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতেও হয়।

মানুষের মনোভঙ্গির একটা বিপুল প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তার সমস্ত প্রকৃতিগত প্রক্রিয়ার ওপরে। সন্তানসম্ভবা হওয়া থেকে শুরু করে ক'মাস সন্তান ধারণ করে থাকার অস্বস্তিকে যদি আনন্দের সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারা যায় তা হলে এ ক'টা মাস স্বাস্থ্য বেশ ভাল রাখা যায় এবং তার ফলে প্রসব সহজেই হয়ে যায়।

অনেকে এ সময়ে সৎ পরামর্শ দিচ্ছে মনে করে এমন সব ভয়ার্ত সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন, যাতে মেয়েদের ধারণা হয়ে যায়, প্রকৃতির নিয়মকানুনের ওপর বিশ্বাস করা যায় না–কি হবে কে জানে, তার ফলে ভয় জাগে।

নানা কারণে মেয়েদের বয়স অল্প থাকতেই সন্তান জন্ম হয়ে যাওয়া উচিত–শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের জন্যেই সেটা বাঞ্ছনীয়। এ বিবেচনায়, বছর ২৫ বয়সেই মেয়েদের প্রথম সন্তান লাভের ব্যবস্থা করে দেওয়া খুবই দরকার।

প্রকৃতি অনেক আগেই মেয়েদের দেহে সন্তানসৃষ্টির প্রস্তুতি এনে দেয়, কিন্তু তাকে কাজে না লাগিয়ে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা আকুলতাকে নিষ্পিষ্ট করে রেখে তাদের সুস্থ মানসিকতার তিল তিল ক্ষতি করা হয়, যার অশুভ প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তাদের অতৃপ্ত দেহের ওপরে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপরেও।

ঠিক বয়সে মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়ে ২/১টি সন্তানের একটি পরিবার-গোষ্ঠী গড়ে তোলার বুক ভরা আশা সার্থক করতে দিলে সমাজে সুখশান্তি অনেক সহজলভ্য হতে পারে।

অর্থনৈতিক অনটনের বাধাবিপত্তি যতই থাকুক, প্রত্যেক মা-বাবারই উচিত উপযুক্ত সময় থাকতে এর জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে থাকা এবং মেয়ের মন সেভাবে তৈরি করে তোলা।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের আরো জানা দরকার

যৌবনের জয়রথে যে-সব যুবক-যুবতী জগতটাকে উপভোগ করতে বেরোয়, তারা যথেষ্ট পরিমাণে যৌনজ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে এবং একটা আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারলে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারোর কোনো আশঙ্কার অবকাশ থাকে না। কারণ, এ-দুটি জিনিস তাদের রক্ষা-কবচের মতো সব সময়ে সব সেরা সব ভাল একটা কিছুর দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হবে না।

যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে কৈশোরে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও আচরণ সমস্যা

কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য এবং আবেগ ও প্রক্ষোভের বৈচিত্র্য সব কিছু মিলিয়ে এমনই অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, তারা নিজেদের নিয়ে অহরহ বিষম বিব্রত বোধ করতে থাকে। তাদের দেহের মধ্যে আপাদমস্তক যে সব দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখে, তার ফলে স্বভাবতই তাদের মন তখন দেহকেন্দ্রিক অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক হয়েই পড়ে।

এসব বিষয়ে নিত্য নতুন অনুভব অনুভূতিও তাদের মনকে নিয়ত তোলপাড় করে রাখে। এরও পরে যখন যৌনাঙ্গে বিশেষ অনুভূতির উপলব্ধি জাগে–ছেলেদের লিঙ্গচ্ছাস হয়, বীর্যপাত ঘটে, যৌনপুলক সৃষ্টি হয় এবং মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়, সে সূত্রে নানারকম অস্বস্তি, বমিভাব, ক্ষুধামন্দ্য, মুখে ব্রণ, স্তনস্ফীতি দেখা যেতে থাকে– তখন থেকে যৌনতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয় আতঙ্ক আর দোষী মনোভাব তাদের নিদারুণভাবে পীড়ন করতে থাকে।

এ ধরনের অহেতুক ভয় আতঙ্ক আর অপরাধী মনোভাবের পেছনে থাকে একটি অস্বস্তিকর মানসিতা, সেটি হল– পরিবারের মধ্যে একটি ছোট শিশুর স্নেহঘেরা মর্যাদা হারিয়ে ফেলার প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ, আর, সে সঙ্গে স্বাধীন স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে পুরোপুরি বড় না হয়ে উঠতে পারার পথে অসহনীয় বিলম্ব।

এসব কারণেই বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের নিজেদের বিশেষ ধরনের নানারকম সমস্যা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা সবই সহানুভূতি সহকারে শুনে সান্ত্বনা দিয়ে পরামর্শ ও পথনির্দেশ বাতলে দেবার উপযোগী কিছু কিছু সহৃদয় স্নেহপ্রবণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজসেবী কর্মী, কল্যাণব্রতী ডাক্তার কিংবা ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সান্নিধ্যে আসা খুবই দরকার।

প্রবীণ লোক মাত্রই জানেন, বয়ঃসন্ধিকালের এ উঠতি বয়সটা খুবই জটিলতায় পূর্ণ হয়ে থাকে। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের মতিগতি বিশৃঙ্খলা আর খামখেয়ালীতে ভরে ওঠে বলেই সকলেই অনুযোগ করতে থাকেন। এসব মন্তব্য করা হলে মনে হয়, কৈশোর জীবনের এ পর্যায়টিতে ছেলেমেয়েরা খুবই বেসামাল হয়ে থাকে, বুঝি তাদের আত্মসংযম, স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণবোধ হারিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়।

এ বয়সের আগে শৈশবকালে ছেলেমেয়েদের অতি যত্নে নিবিড় মনোযোগে মা-বাবা, অভিভাবক-অভিভাবিকারা পালন করে থাকেন। তারা একটু বড় হলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন–আর বুঝি নিয়ত 'দেখ্ দেখ্ ধর্ ধর্' করে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর রাখতে হবে না।

কিন্তু দেখা গেছে, শৈশবের যত্ন আদর ভালবাসার পরিমাণ কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে এতটুকুও কমে গেলে ছেলেমেয়েরা বেশ মনঃক্ষুণ্ন হয়, তারা যথেষ্ট অবহেলিত বোধ করে। এ জন্যেই তারা বেশ অভিমানী হয়ে ওঠে, বড়দের ওপর তাদের দারুণ আক্রোশ জাগে।

শৈশব থেকে যেমন স্নেহ সহানুভূতি পেয়ে বড় হয়েছে, তেমনি যদি যত্ন মনোযোগ কিশোর বয়সেও ছেলেমেয়েরা পেতে তাকে, তা হলে তাদের মন ভাল থাকে, কিছু হারিয়ে যাবার বেদনা মনে জাগে না।

বড়রা হয় তো মনে করেন, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তবে আর এখন শিশুর মতো অত স্নেহমাখা আচরণ করে তো লাভ নেই–তাতে ছেলেমেয়েরা শিশুসুলভ আচরণ নিয়েই থাকবে, আর বুঝি বড় হতেই চাইবে না।

এ সবই ভিত্তিহীন অমূলক এবং মনোবিজ্ঞান বিরোধী হাতুড়ে মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। আগেই যথেষ্ট বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দেহ-মনের এত রকম দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে, তারা দরুণ বিব্রত বোধ করে এবং সে সময়ে তাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সহনশীলতা আর মমতাবোধ একান্তই প্রয়োজন হয়। না হলে তারা এমনই অবহেলিত বোধ করে যে, ক্ষোভে হতাশায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কিশোর বয়সের শুরু হতেই ছেলেমেয়েদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিগুলো থেকে যে সব রসক্ষরণের সূচনা হয়, সেগুলোর প্রভাবে তাদের আবেগ প্রক্ষোভের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, যে পরিবর্তনের ওপর তাদের নিজেদেরও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ জন্যই এ বয়সে যৌন অনুভূতি এবং দুঃসাহসিকতার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, অথচ শরীর বিকাশ সে অনুপাতে দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। তার ফলে, তাদের আচরণে ফুটে ওঠে সামঞ্জস্যের অভাব।

শিশু অবস্থায় ছেলেমেয়েরা যদি কিছুমাত্র সুনিয়মী স্বভাব আয়ত্ব করার সুযোগ না পেয়ে থাকে অর্থাৎ অত্যধিক আদরে বেয়াড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কিশোর বয়সের সমস্যা সঙ্কুল জীবনে মারাত্মক রকমের খাপছাড়া স্বভাবের ছেলেমেয়ে হয়ে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে খুবই।

তবে, এ কথাও খুব ভালভাবে মনে রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র সুনিয়মী হয়ে গড়ে না ওঠার ফলেই বয়ঃসন্ধিকালের কৈশোর জীবনে এলোমেলো ভাব জাগে, তা বলা চলে না। বরং এর বিপরীত হতেও পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শৈশবে মা-বাবা কঠোরভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সুনিয়মের আগড়ে বেঁধে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করার ফলে তারা বড় হয়ে যখনই মাথাঝাড়া দিতে থাকে, তখন থেকেই তাদের নব-অর্জিত কিছু কিছু স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ভাব দেখাতে শুরু করে দেয়।

ছেলেমেয়েদের খুব বেশি কঠোরতার মধ্যে মানুষ করতে চেষ্টা করলে, সকল ব্যাপারে আঙুলের ডগায় উঠতে বসতে তাদের বাধ্য করতে থাকলে, তারা নিজেদের বাস্তব বুদ্ধি কাজে লাগানোর সব ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে, তার কোনই সুযোগ-সুবিধা পায় না।

ছেলেমেয়েদের কি করতে হবে না হবে, সেসব ব্যাপারেই যদি মা-বাবা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন এবং ছেলেমেয়েদের সেসব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সর্বদাই বাধ্য করেন, তা হলে সে ধরনের অহরহ বাধ্যবাধকতার মধ্যে কোনও কিশোর-কিশোরীর পক্ষেই সুস্থ মানসিকতা নিয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় পুষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

এ ধরনের কলের পুতুলের মতো ছেলেমেয়েরা তাদের কৈশোর জীবনে যখন বয়ঃসন্ধিকালের সদ্য বিকশিত ব্যক্তিসত্তার চেতনা নিয়ে স্কুল-কলেজে বা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বের জগতে একটু একটু করে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে, তখন যেন সমুদ্রের অথৈ জলে হাবুডুবু খেতেই থাকবে।

কারণ, তারা কোনও নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজের সিদ্ধান্তে চলতে শেখেনি ছেলেবেলা থেকে–বরং বলতে পারা যায়–সেভাবে চলতে শেখার কোনও সুযোগ-সুবিধাই মা-বাবারা কিছুতেই তাদের দিতে চাননি বাধ্য সুবোধ ছেলেমেয়ে গড়ে তোলার জিদের বশে।

এসব ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে শেখেনি, সুতরাং তাদের চরিত্র সবল এবং সুস্থ হয়ে গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। তার ফলে, তারা যখন

স্বাধীন কর্মক্ষমতার জগতে প্রবেশাধিকার পায়, তখন সেখানে কিভাবে নিজেদের পছন্দমতো, নিজের ইচ্ছা-বাসনা অনুযায়ী স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হয়, তা সত্যিই তারা ঠিক করে উঠতে পারে না। বাস্তবিকই তারা তখন অত্যন্ত দিশেহারা বোধ করতে থাকে।

এ রকম দিশেহারা ভাব থাকার ফলেই বয়ঃসন্ধিকালের অনেক কিশোর-কিশোরীর জীবনধারায় নেমে আসে নানা ধরনের বিপর্যয়। ঠিক যেভাবে তার শৈশবে মা-বাবাই সব সিদ্ধান্ত করে দিতেন, কৈশোর জীবনের দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রেও তখন তার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই তেমনিভাবে অন্যদের নির্দেশে গড়ে উঠতে থাকে। এটা তার সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে নিদারুণ সর্বনাশের পথ খুলে দেয়।

কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের ভারসাম্যহীন আচরণ-বৈচিত্র্যের অন্য একটি গুরুতর কারণ হল–তাদের শৈশবের প্রথম থেকে যে সমস্ত মানসিক আবেগ প্রক্ষোভের অন্তর্দ্বন্দ্ব কঠোর সুনিয়মপন্থী মা-বাবার তাড়ানায় অবরুদ্ধ হয়ে এতদিন গুমরে ছিল, সেগুলো কৈশোরের স্বাধীন চেতনার প্রেরণায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

এর কারণ, কৈশোরের বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের মনোবেগ দারুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং শৈশবের আবেগ প্রক্ষোভগুলো যে সব ভয় আতঙ্ক দ্বিধার তাড়নায় অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, সে ভয় আতঙ্ক দ্বিধা তখন কেটে যেতে থাকে ধীরে ধীরে।

এ কারণেই শৈশবের অনেক অবাঞ্ছিত রুদ্ধ আবেগ আবার নতুন করে প্রকাশ পেতে থাকে কিশোর-কিশোরীদের আচরণের মাধ্যমে। সেগুলো নতুন করে কারো কাছে তাদের শিখতে হয় না–সে সবই যেন পুরনো কবর থেকে ভূতপ্রেতের মতোই বেরিয়ে আসে সকলকে ভয় দেখাবে বলে। কারণ, সেগুলোকে মা-বাবা ধম্‌কে ধাম্‌কে চেপে রাখার বয়স তখন কেটে গেছে।

সুতরাং এভাবে অবরুদ্ধ আবেগের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব উপলব্ধি করলে বুঝতে সহজ হবে যে, শৈশবে যে সব উগ্রতা বা যৌনতা সম্পর্কিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলো মা-বাবার প্রচণ্ড শাসনে অবদমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, তার ফলে ছেলেমেয়েরা হয় তো শাসনের ভয়ে সে সব প্রবৃত্তির চর্চা না করে ভাল ছেলেমেয়ে হয়ে গড়ে উঠেছে বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে সেসব উগ্রতা এবং যৌনতার অভিব্যক্তি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতোই আবার উদ্গীরণ শুরু করতে পারে, কারণ তখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠার আনন্দ অভিযানে স্বাধীনসত্তার মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে চলতে আরম্ভ করছে।

এরই ফলে, একদিন হঠাৎ জানা যায়, একটা 'ভাল' ছেলে বা মেয়ে যেন রাতারাতি বদলে গেছে–হয়ে গেছে বদমেজাজি, দুরন্ত, অবাধ্য, অসভ্য, তার মা-বাবা অভিভাবক-অভিভাবিকার চোখের সামনে, অথচ তাঁদের বুদ্ধির বাইরে, এমন কি, তাঁদের সব রকম নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে– এমন সব আরচণে অভ্যস্ত হচ্ছে, যা সকলেরই কল্পনারও অতীত।

কিংবা এমনও হতে পারে যে, শৈশবের অবদমিত ভয় আতঙ্ক এবং শাসন পীড়নের পুনর্জাগরণের ফলে কিশোর বয়সে নতুন করে আতঙ্কজনিত মনোবিকার সৃষ্টি হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের মনে। কিশোর-কিশোরীরা তখন বুঝতে পারে না, কেন তারা অহেতুক সব সময় আতঙ্ক উদ্বেগে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মেয়েদেরও দেহে এবং মনে কৈশোর পর্যায়ে যখন যৌনতার উন্মেষ জাগে, তখন ছেলেবেলায় তার যৌন অঙ্গ সম্পর্কে ছেলেদের লিঙ্গের তুলনায় যে ধরনের দুশ্চিন্তা জাগত–'কি যেন নেই, কিসের যেন অভাব আছে', সে ধারণা আবার জেগে ওঠে এবং নিজের মনে যুক্তিতর্ক দিয়ে সে বিষয়ে পুরনো আতঙ্ক দূর করতে চেষ্টা করে।

এ কারণেই মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে কৈশোরের সুচনায় অমন সঙ্কোচভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এ সঙ্কোচভাব এনে দেয় সলজ্জ আত্মকেন্দ্রিকতা এবং পুরুষ মানুষদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ভয়ভীতি, অথচ যৌনতার আবেগের জন্যে আকর্ষণবোধও থাকে রহস্যজনকভাবে। এ পরস্পর বিরোধী মানসিকতা তাদের কাছে নিশ্চয়ই মোটেই সুখপ্রদ নয়।

এ সঙ্কট কালে ছেলেমেয়েদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর সুস্থ অভিপ্রকাশের ব্যবস্থা রাখতে পারলে তারা অনেকখানি স্বাভাবিক মানসিকতার অধিকারী হতে পারে এবং তাদের আচরণ সমস্যার ভারসাম্য রক্ষা করতেও পারে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে।

এ ছাড়া, মা-বাবা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নানা করমের দুর্বোধ্য অস্বস্তিকর আচার-আচরণের ফলেও বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীদের বেয়াড়াপনা জাগে। মা এবং বাবা যদি দুজনেই বুঝতে পারেন, ছেলেমেয়েরা এ বয়সে অনেকখানি স্বাধীন সত্তাবোধ নিয়ে বড় হয়ে উঠছে, তা হলে তাঁদের আচার-আচরণ অনেকটা সংযত এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে।

স্বাধীন সত্তাবোধ জেগে উঠলে ছেলেমেয়েরা অবশ্যই নিজেরা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে, কোন কোন কাজ নিজেরাই করে নিতে চাইবে, নিজের মতো ঘর আসবাবপত্র সাজাতে চাইবে। এসব ব্যাপারে যদি অভিভাবকেরা প্রতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চান, তা হলে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ অবশ্যই ব্যাহত হবে, তারা বিরক্তি প্রকাশ করবে বড়দের পরামর্শ মানতে দ্বিধা করবেই।

সুতরাং এ বয়সে সুনিয়ম চর্চা করানোর খাতিরে কঠোর শাসন হুকুম মোটেই সুফল এনে দেয় না। সে চেষ্টা অনেক আগেই স্নেহের মাধ্যমে করার সময় চলে গেছে। সে সময়টা ছিল শৈশব।

ছোটদের সুনিয়মী করে তোলার সুশিক্ষা স্নেহ-সহানুভূতি আর সহযোগিতার মাধ্যমে দেওয়ার উপযুক্ত সময় হল শৈশব। তারপরে কৈশোর এসে গেলে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আর চলে না। সদ্যঅর্জিত স্বাধীনতা তারা উপভোগ করবেই। সে জন্য তখন চাই বন্ধুর মতো সহযোগিতা আর সহানুভূতি।

কিন্তু মায়েরা কিছুতেই ভাবতে পারেন না– তাঁদের ছেলেমেয়েদের কেমন করে নিজের মতে চলতে দেবেন, কেমন করে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারবে। সে সঙ্গে প্রত্যেক পিতাও ভাবতে পারেন না–তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁর কর্তৃত্ব অবহেলা করে কিভাবে সত্যিকারের জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে চলতে পারবে।

তাঁরা দুজনেই যদি মনে রাখতে পারেন যে, ছেলেমেয়েদের বড় করে তোলাই তাঁদের কাজ, স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে নিজেদের দায়িত্বে এগিয়ে চলতে শেখানোই তাঁদের কর্তব্য, তা হলে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখবে।

সে শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করতে পারলেই বন্ধুর মতো, বিজ্ঞের মতো, নেতার মতো তাঁরা সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ বাতলাতে পারবেন।

ঠিক সময়ে ঠিক মতো পরামর্শ না পেলে কিশোর-কিশোরীরা বড়ই অভিমানী হয়ে ওঠে। তারা আধুনিক সমাজের ও শিক্ষা ব্যবস্থার নানারকম জটিলতার মধ্যে যেভাবে বিভ্রান্তিবোধ করে, তার ফলে কাজকর্ম, পড়াশুনা, বন্ধু-বান্ধব, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা, আশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা– এসব নিয়ে নিত্য নিয়ত সঠিক পরামশ খুঁজে ফেরে।

মা-বাবা অভিভাবক-অভিভাবিকারা অনেক ক্ষেত্রেই এসব বিষয়ে নিজেরাই অনেক কিছু আজকাল সঠিকভাবে জেনে উঠতে পারেন না বলে, ছেলেমেয়েরা নিজেদের

উদ্যোগেই এখান-সেখান থেকে যে যতটা পারে, তথাদি সংগ্রহ করে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখতে চেষ্টা করে।

তেমন কোনও খুব জটিল ব্যাপার হলে, ছেলেমেয়েরা কারুর কাছে পথনির্দেশ এবং নির্ভরযোগ্য পরামর্শ না পেলে, তখন তারা অনন্যোপায় হয়ে মা-বাবার কাছে সব শেষে আসতেই বাধ্য হয়। সুতরাং মা-বাবার কর্তব্য হবে, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেমেয়েদের দুশ্চিন্তা লাঘব করা। সেটাই তো প্রকৃত অভিভাবকের ভাবনা।

যৌন বিকার ঃ

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের যৌনতা বিকাশের ক্ষেত্রেও নানা রকম আচরণ সমস্যা এ সব কারণে দেখা যায়। সমকামিতা, প্রদর্শকামিতা, আত্মপীড়ন, যৌনপীড়ন, শিশুর সাথে যৌনতা, পশুর সাথে যৌনতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌন বিকার অনেক ছেলেমেয়ের আরচণের মধ্যেই নানাভাবে এসে পড়তে পারে, তীব্র যৌন আবেগের ওপর সংযমেরই অভাবে।

তবে, মনে রাখা ভাল, কিশোর-কিশোরীদের সদ্য উন্মোষিত যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের যৌন বিকারগুলোকে খুব বেশি গুরুত্ব দিলে ভুল হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো নিছক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবেই অল্পস্বল্প তারা চর্চার সুযোগ পেয়ে যায়। এ ধরনের অনিয়মিত যৌন আচরণ তাদের জীবনধারায় স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি বড় একটা করে না।

যদিও কোনও ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, এ ধরনের বিকৃত যৌন চর্চা কোনও ছেলেমেয়ের জীবনে পাকাপাকি বাসা বেঁধে যাচ্ছে, তা হলে কোনও অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নেওয়া অবশ্য তখন একান্ত প্রয়োজন বলে ভাবতে হবে।

তবে বিশিষ্ট সমাজ মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ম্যাবেল ফনসেকা এ প্রসঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, কিশোর-কিশোরীদের সমকামিতা সমস্যা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। তিনি তাঁর গবেষণানিরীক্ষায় লক্ষ্য করেছেন যে, যৌন রহস্যের অভ্যন্তরে আপন উদ্যোগে অভিযান শুরু করার প্রথম স্তরে ছেলেরা ছেলেদের কাছে এবং মেয়েরা মেয়েদের কাছে যৌনাঙ্গের পরিচয় বিনিময় করতেই থাকে। কিছুদিন পরে উভকামিতার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা এলে, সমকামিতার চর্চা আপনা থেকেই চলে যায়।

স্কুলের ছোট মেয়েরা যখন বাথরুমে যায়, অনেক সময়ে দু'জনে বা কয়েকজনে মিলে ঢোকে। উদ্দেশ্য, সংগোপনে পরস্পরের যৌনাঙ্গের পরিচয় কিছুটা বিনিময় করে আসা। ছেলেরাও এ রকম করে থাকে। অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ে এ অভ্যাস রপ্ত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ই থাকে না।

তবে, ডাঃ ফনসেকা এ কথাও বলেছেন যে, কোন ছেলের বাবা খুব দূরে যদি থাকেন, কিংবা বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, অথবা সংসারে বাবার ভূমিকা কর্তৃস্থানীয় না হয়, তা হলে সে ছেলে তার বাবার সঙ্গে শূন্য সম্পর্ক পরিপূরণ করার তীব্র বাসনায় কোনও ছেলের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও পারে, এবং তার কাছে ভালবাসার মর্যাদা পেতে গিয়ে তার সঙ্গে সমকামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক হতেও পারে।

কোনও কিশোরী মেয়ে যদি তার বাবার কাছাকাছি বেশির ভাগ সময় থাকে এবং তাঁর সর্বক্ষণের সহযোগীর মতো চলতে দেখা যায়, তা হলেও সে মেয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু পুরুষালী ভাব সঞ্চারিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

এ রকম হওয়ার আরও একটি কারণ হতে পারে এ যে, মা এবং মেয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ভাবে তীব্র তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে, কিশোরী বয়সেই সে মেয়ে হয়ে উঠেছে নারীসত্তা-বিরোধী। স্নেহ ভালবাসা মমতা দিয়ে মা নিশ্চয়ই সে মেয়েকে নারীসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রতি আগ্রহান্বিত এবং স্বাভাবিকভাবে আবিষ্ট করতে পারেন নি। তাই, সে মেয়েটি অভিমান ভরে পুরুষের ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করে তার নারীসত্তাকে অবহেলা করার চেষ্টা করে থাকে।

এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিণামে কোনও মেয়ে সচেতন ইচ্ছায় কিংবা অবচেতন তাড়নায়, নিজেকে পুরুষ-সত্তার সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে সমকামিতার মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়ার অদম্য বাসনায় অধীর হয়ে উঠতেও পারে।

এ ছাড়া, অনেক সহজ স্বাভাবিক মেয়েরাও সবরকম নারীসুলভ আচরণ ও ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বহন করা সত্ত্বেও সমকামী হতে পারে এবং অন্য মেয়েদের সাহায্য নিয়ে নিজের যৌনাঙ্গে এবং যৌন সচেতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুলক সৃষ্টির চর্চা করতেও পারে।

এ ধরনের সমকামী মেয়েরা অন্য ছেলেদের সঙ্গ লাভে ভয় পেতেই শিখেছে ছেলেবেলা থেকে। অল্প বয়স থেকেই তারা এটাই তাদের মায়ের কাছ থেকেই হয় তো শুনে এসেছে যে, ছেলেদের সঙ্গ সব সময়ে এড়িয়ে চলতে হয়, তারা না কি মেয়েদের দারুণ ক্ষতি করে দিতে পারে, জীবন নষ্ট করেও দিতে পারে।

এভাবে যে সব মেয়েদের বিকারগ্রস্ত মানসিকতা গড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কৈশোর পর্যায়ে যৌনতা উন্মেষের অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সমকাম চর্চায় আগ্রহী না হয়ে উপায় নেই।

এ বয়সে ভালবাসার তীব্রতম অভিব্যক্তি হল যৌনতা, এ কথা সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝতে পারলে ছেলেমেয়েদের অসমরতি বা উভকামিতা অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের পারস্পরিক যৌন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের চর্চাকেও ভয় পাওয়ার কিছুই থাকতে পারে না।

পারস্পরিক আকর্ষণ

ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের এ সঙ্কটময় পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীরা বয়স্ক জীবনধারার দিকে পা বাড়াবার প্রস্তুতি রূপে নিজেদের সমবয়সীদের মধ্যে জোট বেঁধে সব কিছু করার দল মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে বর্জন করতে থাকে। ইতিমধ্যে তারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধের সদ্য বিকশিত চেতনার প্রেরণা নিয়ে আপন আপন পছন্দমতো আদর্শবোধে মগ্ন হতে চেষ্টা করে, নিজের নিজের পৃথক ব্যক্তিসত্তাকে আলাদা করে ফুটিয়ে তুলতে মনোযোগী হয়।

ভিন্ন ভিন্ন আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোর-কিশোরীরা এ বয়সে ছেলেরা মেয়েদের দিকে এবং মেয়েরা ছেলেদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, পরস্পরকে ভালবাসতে চায়। বিশেষ করে ষোল থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলেরা এবং তারও আরও একটু আগে মেয়েরা এ ধরনের পারস্পরিক ভাল লাগার আকর্ষণে দোলায়মান হতে থাকে।

এ আকর্ষণের উভয়মুখিতার মাধ্যমে শুধু যে যৌন অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আগ্রহ থাকে, তা নয়। কিশোর-কিশোরীর সমগ্র সাংস্কৃতিক সত্তা এবং আদর্শবোধের পরিচয় আদান-প্রদানও চলতে থাকে মূলত এ পারস্পরিক আকর্ষণ-চর্চার মাধ্যমে—যেটা তাদের উভয়ের ব্যক্তিত্ববিকাশকে করে তোলে সুসামঞ্জস্য আর পরিপূরক।

এ ভাল লাগার আকর্ষণ যে যৌন সংসর্গ এবং বিবাহের আকুলতার ভিত্তি বলে অনেকে মনে করেন আর সে জন্য আতঙ্কবোধ করেন, এসব উপযোগিতার বিবেচনায় সেটা অবশ্যই যথার্থ নয়।

প্রধানত এ পারস্পরিক আকর্ষণবোধের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা পরস্পরকে সব দিক দিয়ে ভালভাবে জানতে এবং বুঝতে চায়। সে অভিজ্ঞতা লাভের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে তারা কখনও পরস্পরের যৌন অনুভূতি রহস্যের প্রতি আগ্রহী হতেও পারে, কখনও-বা শুধুমাত্র নানা বিষয়ে আগ্রহ-অনুরাগ, তথ্য এবং ভাব বিনিময় করেই তৃপ্তি পেতে পারে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুজন দুজনের পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, সাহিত্য শিল্পচর্চা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আগ্রহ বিনিময় করেও আনন্দ পেতে চায়।

অনেক পরে আসে সত্যিকারের ভবিষ্যৎ জীবনের স্থায়ী জোট বাঁধার কল্পনায় প্রেম, ভালবাসা যৌন সম্পর্কের জটিল ভাবনা-চিন্তা। তখন তারা নিজেদের সন্তান সৃষ্টি করে একটি পৃথক পরিবার-গোষ্ঠী গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্বের জন্য স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হতে থাকে।

স্বভাবতই, বয়স্ক জীবনের প্রস্তুতি মানেই দুঃসাহসের প্রস্তুতি, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য। সুতরাং কৈশোর পর্যায়ের শেষ পর্বে জীবনের অন্য সব বিষয়ের মতো, খেলাধুলা, সঙ্ঘ সংগঠন, ভ্রমণ অভিযান, পিকনিক, নানাপ্রকার 'হবি', সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি চর্চার মতো, যৌনতার ক্ষেত্রেও দুঃসাহসের চর্চা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সেটা মানব সমাজ এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অকারণে নিন্দনীয় মনে হলেও, সহানুভূতি সহকারে বুঝতে হবে যে, প্রকৃতি-পুষ্ট এক প্রবৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্যই সেই দুঃসাহস যুগযুগান্ত ধরে চর্চা করে আসতে হচ্ছে তাদের।

অঙ্ক শিখতে গেলে যেমন অঙ্কের সমস্যা সৃষ্টি করে তার সমাধানের চর্চা করতে হয়, তেমনি বয়ঃসন্ধিকালের শেষ পর্বে কিশোর-কিশোরীরা পরবর্তী বয়স্ক জীবনের বৃহত্তর সমসাদির মোকাবিলার প্রস্তুতি স্বরূপ, তারা নিজেরাই সমস্যার সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, সে সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে চায়, নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে চায়।

এ অভিযানে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে যুগ-যুগ ধরে, তাতে বিদ্রোহ জেগেছে, কত ছেলেমেয়ের দুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েও গেছে। তাই, আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞানীরা অন্য কোনও উপায় না পেয়ে প্রকৃতির নির্দেশ মেনে নিতেই আজ পরামর্শ দিচ্ছেন। কিশোর-কিশোরীদের বাস্তব যুক্তিসম্মত পথনির্দেশ দিয়ে, সহানুভূতি সহকারে তাদের বয়স্ক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার কথাই তাঁরা আজ শোনাতে চাইছেন অভিভাবকদের।

সহজভাবে ছেলেমেয়েরা মেলামেলা করলে তাদের লজ্জা আড়ষ্টতা কেটে যায় এবং স্বচ্ছন্দভাবে অন্যসকলের সঙ্গে কথা বলার সাবলীলতা অর্জন করতে পারে।

পরস্পরকে দেখে, আলাপ-আলোচনা করে, নানা বিষয়ে চিন্তা বিনিময় করে, বনভোজনে, পিকনিকে, উৎসবে যোগ দিয়ে, ছেলেমেয়েরা মেলামেশার মধ্যে দিয়েই তাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ভাবেই তাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে, আর সমাজের বৃহত্তর পরিবেশে আত্মনিয়োগের যথার্থ যোগ্যতা এবং নেতৃত্বও অর্জন করে।

শারীরিক ব্যায়ামের ভূমিকা

ব্যক্তি ঠিকমতো গড়ে তোলার জন্য সব ছেলেমেয়েরই নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চা করা উচিত। ইদানীং যোগব্যায়াম চর্চার দিকে অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এটা খুব ভাল কথা। এগুলো শরীর ও মনে প্রফুল্লতা এবং সজীবতা সৃষ্টি করে, আর তার জন্যই ব্যক্তিত্বে মাধুর্য আছে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা, উষাপান, প্রাতঃভ্রমণ, হালকা পোশাক পরা, চা-কফি উত্তেজক পানীয় বর্জন, অতিরিক্ত মাছ, মাংস ঝাল মশলার রান্না পরিহার প্রভৃতি সাত্ত্বিক অভ্যাস চর্চা করলেও যৌন আবেগ প্রশমিত রাখা যায়।

যে সব কাজে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করতে হয়, সে ধরনের কাজেও ছেলেমেয়েদের এ বয়সে যতটা পারা যায় আগ্রহী করে তোলা খুব দরকার। কারণ, বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত্বকে শানিত এবং সুস্থ করে তোলে।

সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাও এ বয়সে ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রয়োজন। সমাজসেবামূলক কাজ, জনহিতকর কাজ, নানা ধরনের খেলাধূলা, 'হবি', শিল্পকলা চর্চা– এসব নিয়ে কিশোর-কিশোরীরা মগ্ন থাকতে শিখলে তাদের সৃজনশীল ব্যক্তিত্ববিকাশ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলে। তার ফলে যৌন আকুলতাও অনেকাংশে সংযমী হয়ে ওঠে।

কিশোর বয়সে অনেক ছেলে বাড়িতে নানা কারণে উপযুক্ত স্নেহ-ভালবাসা না পেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিপথগামী পরামর্শ লাভ করে নিছক মজা করার জন্যে, অভিজ্ঞতা অর্জনের আশায় অনেক সময়ে বারবনিতা পল্লীতে যাবার প্রবণতাও লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে, কিশোরী মেয়েরাও নানা পারিবারিক অশান্তি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিকারে বারবনিতা বা কল্-গার্লে জীবিকা গ্রহণ করতে পারে। এ আচরণ সমস্যা অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায়। এর মূল কারণ হল– উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা-বাবার বা অভিভাবকের সহানুভূতিহীন নির্মম কঠোর আচরণ এবং তার পরিণামে কিশোর-সত্তার বিদ্রোহ ঘোষণা।

এর প্রতিকার করতে হলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে, স্নেহ-ভালবাসা দরদ-মমতা যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে এবং বিদ্রোহী কিশোর সন্তান-সন্ততির অদম্য যৌন আবেগ প্রশমিত করার জন্য সাত্ত্বিক জীবনধারা পরিবার পরিবেশে অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে। সংসারের দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবার মতো সহনশীলতা তাদের সামনে আদর্শরূপে তুলে ধরতে হবে।

এ ধরনের ছেলেমেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স এলেই বিবাহের ব্যবস্থা করলে তাদের উদ্দাম জীবনধারা সুস্থ সমাজায়িত হয়ে সৎপথে ফিরে আসতে পারে।

যৌন ব্যাধি ও তার প্রতিরোধ

কেশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর মধ্যে একটা বিষম অস্বস্তিকর গুপ্ত সমস্যা হল–যৌন অঙ্গে কোন কোন ব্যাধির সম্ভাবনা।

কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের ব্যাধির প্রকৃতি বা কার্যকারণ কিছুই ভালভাবে জানে না, এমন কি, তাদের মা-বাবাও অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সে সব যৌন ব্যাধির স্বরূপ, সেগুলোর সংক্রমণ প্রক্রিয়া বা প্রতিকার প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না।

বিবাহের আগে যৌনতা পরিহার করে চলাই আদর্শ সদভ্যাস বলে সকলকে মেনে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সে আদর্শ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই সব সময়ে থাকে। অনেকেই সে আদর্শ মেনে চলতে পারে না বলেই যৌন শিক্ষা দেবার সময়ে যৌন ব্যাধি বলে যে একটা উপদ্রব আছে, সে বিষয়ে কিছু না বুঝিয়ে দিলে যৌনতা সম্পর্কে পরামর্শ এবং পথ-প্রদর্শন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

যৌন অঙ্গের নানারকম উৎকট দূরারোগ্য ব্যাধি আজকাল সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এসব অসুখ দেহ ও মনকে সব দিক দিয়ে একেবারে বিষাক্ত করে ফেলছে গোপনে গোপনে। না জেনে উঠতি বয়সের কত ছেলে-মেয়ে যে এ সব বিশ্রী অসুখের কবলে পড়ছে, তার বোধহয় হিসেবনিকেশ করাও যায় না।

এ বিষয়ে যে সব কথা ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে, সেগুলো যেন শুদ্ধ কাজের কথাই হয়। কল্পনার রং ছড়িয়ে ভাব আবেগ দিয়ে অতিরঞ্জিত করে কিছু বলা খুবই ক্ষতিকর হবে এ ব্যাপারে।

যৌন ব্যাধি বলতে প্রচলিত ধারণায় যা বোঝায়, তা হল– ছেলেদের লিঙ্গে বা মেয়েদের যোনিতে চুলকানি, ক্ষত চিহ্ন বা ঘোলাটে রস নিঃসরণ তার সঙ্গে থাকতে পারে প্রস্রাবের সময় জ্বালাবোধ।

এ সব ব্যাধির লক্ষণ ছেলেমেয়েরা জানতে পারলেও লজ্জায় ভয়ে বড়দের কিছুই জানায় না, আর সে গোপনতার আড়ালেই সমস্যার গভীরতা দিন দিন বেশ বাড়তেই থাকে। আতঙ্কে দুশ্চিন্তায়, বিরক্তি আর অস্বস্তিতে তাদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতায় কালিমা দেখা দেয়, শরীর ভেঙে পড়ে, ক্রমেই বদমেজাজি হয়ে যেতে থাকে।

অথচ সব ক্ষেত্রেই যে কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের যৌন ব্যাধির জন্যে নিজেরা দায়ী বা দোষী, তা নয়। তবু নানাপ্রকার সামাজিক কারণে তাদের যৌনতা সম্পর্কে এমনই দোষী মনোভাব অতি অল্প বয়স থেকে গড়ে ওঠে যে, এ অস্বস্তিকর যৌন ব্যাধির কথাও তারা মন খুলে বলতে চায় না, বড়দের অহেতুক তিরস্কার, ভ্রুকুটি আর লাঞ্ছনার ভয়ে।

তবে, ছেলেমেয়েদের আচরণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখলে সহানুভূতিসম্পন্ন অভিভাবকদের পক্ষে তাদের এ ব্যাধির অস্বস্তি বুঝতে পারা খুব কঠিন হয় না। যৌনাঙ্গে চুলকানি হলে ছেলেমেয়েদের হাতের অস্থিরতা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় এবং তখন একান্তে সহানুভূতি সহকারে তাদের প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয় কোনও অস্বস্তি আছে কি না। সহানুভূতি দরদ এবং সহযোগিতার আশ্বাস পেলে ছেলেমেয়েরা তখন তাদের অস্বস্তির কারণ খোলাখুলি জানাতে দ্বিধা করে না।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যৌনাঙ্গ সব সময়ে পোশাকের নিচে ঢাকা থাকে বলে যথাযথভাবে পরিষ্কার করার সুযোগ-সুবিধা হয় না। তা ছাড়া, প্রতিবার প্রস্রাব করার পরে লিঙ্গ বা যোনিতে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার সদভ্যাসটিও অনেক ছেলেমেয়ে বড়দের কাছ থেকে কখনই শেখেনি। ফলে, সব সময়ে ঢেকে থাকা যৌনাঙ্গের কোণে খাঁজে ঘাম জমে, তার সঙ্গে ময়লাও জমে এবং সেগুলো পরিষ্কার না করলে স্বভাবতই চুলকানি হতে পারে।

প্রতিবার প্রস্রাবের পরে এবং স্নানের সময়ে যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলার অভ্যাস যদি ছোট বয়স থেকেই করানো হয়, তা হলে চুলকানির অস্বস্তি সৃষ্টি হতে পারে না।

সাধারণভাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সদভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে এ অস্বস্তির কারণ অনেকাংশে দূর হয়। এর ফলে চুলকানির মাধ্যমে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনাও কমে যায়।

এ সত্ত্বেও যদি চুলকানি থাকে এবং তা অসহনীয় মনে হয়, তা হলে অল্প গরম পানিতে দু'চারটি পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দানা ফেলে দিয়ে সে ঈষৎ বেগুনী রঙের পানি দিয়ে কয়েকটা দিন ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গ ধুতে শেখালে তারা স্বস্তি পেতে পারে। এর পরে যৌনাঙ্গ-মুখ শুকনো করে সেখানে কোনও রকম বোরিক মলম কিছুটা লাগালে সাধারণত চুলকানি আর থাকে না।

এ ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসাদির পরেও যদি যৌনাঙ্গের চুলকানি অব্যাহত থাকে, তা হলে ডাক্তারের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরামর্শ করা উচিত। কারণ, চুলকানির পেছনে তখন কোনও সংক্রমণ আছে বুঝতে হবে।

চুলকানি ছাড়াও যদি ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গে কখনও কোনও রকম প্রদাহ বা জ্বালা যন্ত্রণা হয়, তা হলে যতশীঘ্র সম্ভব অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কিংবা হাসপাতালে দেখানো উচিত। কারণ, প্রস্রাবের সময় এবং পরে যৌন প্রদাহ হলে বুঝতে হবে উদ্বেগজনক কোনও সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে।

যৌন-প্রদাহের কারণ হতে পারে যে সব যৌনব্যাধি, সেগুলোর মধ্যে গনোরিয়া, সিফিলিস, স্যাংক্রয়েড প্রভৃতি বিশেষভাবে আশঙ্কাজনক। যে সব বীজাণু থেকে এ সব যৌন ব্যাধি সৃষ্টি হয়, সেগুলো ভিজা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে সব ছেলেমেয়ে যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখে না এবং শুকনো রাখতে চেষ্টা করে না, তাদেরই এ রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা হয় বেশি।

গনোরিয়া নামে যৌন ব্যাধি সবচেয়ে বেশি হয়। ফলে যৌনাঙ্গ থেকে হলদে-সবুজ পুঁজরস নির্গত হয়। ছেলেদের মূত্রনালীতে এবং মেয়েদের যোনিপথে গনোবক্কাস নামে এক ধরনের বীজাণু এ রোগের সৃষ্টি করে। যৌনাঙ্গ থেকে মলদ্বারেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। হাতের স্পর্শ থেকে সে সংক্রমণ চোখেও ছড়াতে পার।

আজকাল স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, সালফানোমাইড প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসকরা এসব সংক্রমণ সমূলে বিনাশ করতে পারেন। কিন্তু ভয়ে বা লজ্জায় এ রোগ লুকিয়ে রাখলে ছেলেমেয়েদের জীবনের স্বাস্থ্য সুখ শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসে।'

সিফিলিস নামে যৌনব্যাধি আরও মারাত্মক। বংশানুক্রমে কিংবা পরিবেশের সংক্রমণ থেকে এ দুষ্ট ব্যাধি কোনও রকমে ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গে বাসা বাঁধলে ধীরে ধীরে অতি

সংগোপনে সারা-দেহে –মুখে জিভে, গলায়, চোখে, এমন কি, মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়ে। দেহের বিভিন্ন সন্ধিস্থল ফুলে ওঠে, কিছুতেই সারতে চায় না। যেখানে সেখানে বিশ্রী ধরনের ক্ষত চিহ্ন দেখা দেয় যা অস্থিমজ্জাতেও আক্রমণ করে।

এ কারণেই ছেলেমেয়েদের যৌনাঙ্গে কখনও কোনও ফুসকুড়ি বা ক্ষত দেখা গেলে তাদের সতর্ক হতে শেখানো উচিত। রোগ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সময় না দিয়েই ডাক্তার দেখিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া একান্ত দরকার। অরিও মাইসিন, টেরামাইসিন, পেরিনিলিন জাতীয় নানা ধরনের ওষুধের কাছে এ মারাত্মক ব্যাধি আজ হার মেনেছে।

কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের দেহে এ ধরনের যৌন ব্যাধি সংক্রমণের লক্ষণ দেখলেই অভিভাবকেরা বিশেষভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন স্বভাবতই। তাঁরা ভাবেন; ছেলেমেয়েরা অসৎসঙ্গে মেলামেলা করার ফলে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এসব রোগের কবলে পড়েছে। এটাই সচরাচর আশঙ্কা করা হয়ে থাকে। অনেকে এমনও মনে করেন যে, একমাত্র বারবনিতা সংসর্গ করলেই এসব যৌনব্যাধি সংক্রমিত হয়।

যৌন ব্যাধি বিশেষজ্ঞরা বলেন, বারবনিতারা নিজেদের দেহকে তাদের ব্যবসা বা উপজীবিকার সামগ্রী বলে বিবেচনা করে বলেই দেহের, বিশেষত যৌনাঙ্গে যথেষ্ট যত্নই করে। তাদের যৌনাঙ্গে ব্যাধি থাকলে উপজীবিকার পথে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় তারা নীরোগ থাকার সব রকম চেষ্টাই করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, চিকিৎসা করানো তাদের উপজীবিকারই স্বার্থে বাধ্যতামূলক মনে করে। তাদের কাছে যৌন ব্যাধি বহন করে নিয়ে যায় নিম্নশ্রেণীর অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের বিভিন্ন পুরুষেরাই।

এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকদের সহানুভূতি সহকারে জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, ছেলে-মেয়েদের যৌনাঙ্গে কোনও রকম ব্যাধি হয়েছে জানা গেলে, বারবনিতা সংসর্গের সম্ভাবনা ভেবে তাদের প্রতি সন্দেহজনক ভ্রুকুটি না করে, ভরসা আশ্বাস দিয়ে সব আগে তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

কারণ, বারবনিতা সংসর্গ না করলেও কিশোর-কিশোরীরা বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে পারস্পরিক যৌনমেহনের মাধ্যমেও এসব রোগ সংক্রমণের শিকার হতে পারে। এমন কি, যারা সমকাম চর্চা করে অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের এবং মেয়েরা মেয়েদের যৌনাঙ্গ নিয়েই কেবল কৌতূহলের বশে যৌনচর্চা করে, তাদেরও বংশানুক্রমে যৌনব্যাধি সংক্রমণ হতে পারে।

এসব যৌনব্যাধি বংশপরম্পায় হতেও পারে এবং তারও মূল কারণ যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসের অভাব আর আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সঙ্কোচ।

অভিজাত পরিবারে বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক সজাগ যত্ন লক্ষ্য করা গেলেও আভ্যন্তরীণ শুচিতা রক্ষার উপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার সুশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক মতো ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় না বলেই এসব ব্যাধি প্রচ্ছন্নভাবে সংক্রমিত হতে পারে।

সুতরাং কৈশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের দেহে যৌনব্যাধির উৎপাত যাতে তাদের সুস্থ বিকাশ ব্যাহত করতে না পারে, সেজন্য তাদের মধ্যে এমনভাবে সময় থাকতে সদভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যাতে তারা এ সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ করতে শেখে।

মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই হল এ ব্যাধির আসল প্রতিরোধ। আর দরকার, বয়ঃসন্ধিকালে যৌন কৌতূহল বশে ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক যৌনমেহনের অভ্যাসের কুফল সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়া।

মা-বাবা শিক্ষকদের সহানুভূতি ও সযোগিতা

কৈশোর পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের যৌন আচরণ সমস্যা নিয়ে যত আলোচনা- পর্যালোচনা করা যাবে, ততই বোঝা যাবে, যে, এ সমস্যার পেছনে কিশোর-কিশোরীদের অজ্ঞতা যেমন আছে, তেমনি আছে তাদের মা-বাবা, শিক্ষক -শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও অজ্ঞতা, আর আছে কিশোর-কিশোরীদের যৌন চেতনার উন্মেষ সম্পর্কিত সমস্যাসঙ্কটের প্রতি তাঁদের যথোপযুক্ত সহানুভূতি এবং সহযোগিতারও নিদারুণ অভাব।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের মা-বাবা, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ভুল বোঝাবুঝির জন্যে নিদারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। তাদের অভিযোগ, বড়রা তাদের ওপর প্রায়ই অবিচার করেন, তাঁরা নিজের ছেলেমেয়েদের অহরহ অবিশ্বাস করেন এবং প্রভু-ভৃত্যের মতোই আচরণ করেন। এসব অভিযোগ সমর্থন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী-চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বেনজামিন স্পক্।

সত্যিই, মা-বাবা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি বড়রা কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন যেন রুখে ওঠেন। অর্থাৎ জেরা করার ভঙ্গিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা বলা শুরু করেন। এ ধরনের আচরণ বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের বিলক্ষণ বিরক্তি ঘটায়।

অভিভাবক-অভিভাবিকারা কিশোর-কিশোরীদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের বশেই তাদের কল্যাণ-চিন্তায় সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন এবং সে কারণেই ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হয়ে যাবার ভয়ে উদ্বিগ্ন হন। ছেলেমেয়েরা তাদের সদ্যলব্ধ বয়ঃসন্ধিকালের উপযোগী স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য বোধ অর্জন করা সত্ত্বেও বড়রা সে স্বাধীনতার যোগ্য মর্যাদা দিতে চান না। ছেলেমেয়েরা এ ধরনের মর্যাদাহানিকর আচরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়।

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা তাদের সমাজ-চেতনার বৃহত্তর পরিবেশে প্রবেশ করতে চায, নানা জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। পরিবারভূক্ত বড়দের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সরস ভাব সম্পর্ক বজায় না থাকলে কিশোর-কিশোরীরা খুব বেশি বহির্মুখী হয়ে পড়ে এ কারণেই।

সে জন্য উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাধীনচেতা চলা-বলা মানিয়ে নিয়ে, তাদের সঙ্গে ঠিক সমবয়সী বন্ধুর মতোই বড়রা যদি আচরণ করতে পারেন, তা হলে বহিমুর্খী হওয়ার প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণের লাগাম টেনে রাখা খানিকটা সহজসাধ্য হয়।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের নবলব্ধ শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার আনন্দে সকলেই একটু-আধটু বিদ্রোহীভাবাপন্ন হতে দেখা যায়। তারা বড়দের আধিপত্য ছেলেবেলার মতো আর ততটা মানতে চায় না। বড়রা বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারলে সহজেই এসব বিদ্রোহী ভাবাপন্ন কিশোর-কিশোরীদের সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল ছাঁটার কায়দা, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নির্বাচনের ব্যাপারেও কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজস্ব বিচার-বিবেচনার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। এটাও তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব (ইনডিভিজুয়ালিটি) বিকশিত হয়ে ওঠার শুভ লক্ষণ।

কিন্তু বড়রা এ ধরনের কিশোর-সুলভ স্বাধীন বিচার-বিবেচনা খুব সহজে পছন্দ করেন না এবং এতে তাঁরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করেন, বিরক্ত হন। ফলে, কিশোর-কিশোরীরা তাদের মনোমত একটি নিজস্ব সমাজ পরিবেশ গড়ে তোলার আকুলতায় বাধা পায়।

তারা তখন জোর করে ঐ সব পছন্দমতো কাজ করে এবং বড়দের তাতে বিরক্ত হতে দেখে মনে মনে বেশ তৃপ্তি পায়। কারণ, ছেলেমেয়েরা মনে করে, বড়দের পছন্দের ওপর তাদের আধিপত্য অন্তত খানিকটাও কার্যকরী করতে পারছে।

এ আপাত বিদ্রোহী মনোভাবের মূলগত কারণ হল এ যে, ছেলেমেয়েরা এ বয়সে তাদের স্বভাব এবং আচার-আচরণের নেতৃত্ব নিজেরাই দিতে চায় আর সে নেতৃত্ববোধ সুস্থ স্বীকৃতি লাভ করলে , যার কাছে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, তার অনুগামী হয়ে থাকাই সহজ স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া।

নিজের বিচার-বিবেচনা স্বীকৃতি পাওয়ার অন্য একটি অর্থ হল– নিজের বয়ঃপ্রাপ্তির মর্যাদাবোধ অর্জন। এ মর্যাদাবোধের অনুসারী অবশ্যম্ভাবী মনোভাব হল দায়িত্ববোধ। তারা তখন এ দুই উচ্চমণ্যতা নিয়ে বড়দের চমক লাগিয়ে খুশি করতে চায়।

কিন্তু বিচার-বিবেচনার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা আদায় করার জন্যে কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের যেন একটা মারাত্মক রকমের ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে ঘরে ঘরে।

এ রকম পরিস্থিতিতে বড়দের খুবই নম্র আচরণ এবং সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। কোনও রকম কঠোর কর্তৃত্বমূলক আচরণ সত্যিকারের কল্যাণকর ফল লাভের সহায়ক হয় না।

কঠোরতা এবং অনমনীয় কর্তৃত্বের চাপে কিশোর-কিশোরীদের বিদ্রোহী মনোভাব আরও জ্বলে ওঠে। তাদের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাকৃতিক মনঃশক্তি যে কতখানি তেজোময়, সে কথা অভিজ্ঞ অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের মা-বাবা কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ির ব্যাক্তিত্বভিত্তিক সংঘাত এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলতে থাকে। এ ধরনের পারিবারিক পরিবেশে যে সব কিশোর-কিশোরী বড় হয়ে ওঠে, তারাও সে অস্বস্থিকর পরিবেশের কুফল ভোগ করে এবং নিজেদের মা-বাবার নির্দেশ-পরামর্শের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোনও দোষ খুঁজে পায় না, বরং সেটাকেই স্বাভাবিক জীবন-বিকাশ পদ্ধতি বলে মেনে নেয়।

এসব ক্ষেত্রে, কিশোর-কিশোরীদের বিদ্রোহী মনোভাব হয় প্রচণ্ড ধরনের। সুতরাং ছেলেমেয়েদের স্বার্থে এ ধরনের পরিবার পরিবেশে বড়দেরই উচিত নিজেদের সংঘাতমূলক আচরণে সংযমী হয়ে ছেলেমেয়েদের কল্যাণ চিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়া।

কিশোর-কিশোরীদের বিদ্রোহী মনোভাবের উৎস এবং কার্যকারণ সম্পর্কিত এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল– এ ধরনের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ছেলেমেয়েরাই মানসিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরক্তির চাপ থেকে খানিকটা মুক্তি পাবার আকুলতায় নানাধরনের যৌন আচরণ সমস্যার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।

এ রকম সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এ কারণে বড়দের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা অহরহ প্রয়োজন, যাতে ছেলেমেয়েরা সুস্থ মানসিকতার মাধ্যমে নিজেদের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যবোধের মর্যাদা উপলব্ধি করে সংযত জীবনযাপন করতে প্রয়াসী হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে মা যদি তাঁর ছেলেবেলায় কোনও সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তা হলে মানসিক ঈর্ষাবিকারের ফলে তিনি তাঁর কিশোরী মেয়ের সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যে বাধা দিতেও পারেন কল্যাণের অজুহাতে। কিশোরী মেয়ে যদি এ ধরনের মনোবিকারের বিরোধীতা করে, তখন মায়ের চোখে সে মেয়ে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, বেয়াড়া।

এসব ক্ষেত্রে মা যদি সহানুভূতিসম্পন্না এবং উদার মনোভাবাপন্না প্রকৃত কল্যাণময়ী জননী হবার চর্চা করেন, তা হলে নিশ্চয়ই নিজের বাল্যকালে যা পাননি, নিজের মেয়েকে তা পেতে দেখে খুশি ছাড়া অন্য কিছু হবেন না।

মা-বাবা এবং বড়দের যথেষ্ট সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে যে, কিশোর-কিশোরীরা যে বয়ঃসন্ধি পর্যায় অতিক্রম করতে চাইছে, সেটা বয়স্ক জীবনে প্রবেশেরই প্রাক্-পর্যায়। সুতরাং ধীরে ধীরে নানাধরনের স্বাতন্ত্র্যসূচক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে চাইবেই।

ব্যক্তিগত কর্মধারায়, নীতিগত আচার-আচরণ, কর্মজীবনের দায়-দায়িত্ব পালনে এমন কি, নব-উন্মেষিত যৌনতা বোধেরও যাচাই করে নেবার স্বাধীন প্রবণতা জাগবেই। নিজেকে পূর্ণতার মাপকাঠিতে তারা অহরহ পরিমাপ করে নিতে তো চাইবেই।

তাই, অদম্য আকুলতায় তারা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যাচাই করতে গিয়ে এমন কাজ করতে থাকবে, যা দেখে মনে হবে ছেলেমেয়েগুলো এমন নির্লজ্জ হল কেমন করে! প্রকৃতপক্ষে, সে নির্লজ্জতা হল কিশোর কিশোরীদের আসন্ন বয়স্ক জীবনের দুঃসাহসিকতার প্রাক্-পর্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ত চর্চা।

কিশোর বয়সে যৌন আচরণ সমস্যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে এ দুঃসাহিসকতা। এ মানসিকতা থেকেই যৌনতাবোধের পূর্ণ পরিণতি ঘটতে থাকে, আর এ পরিণতির পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে পরস্পরের ভালবাসা, পরস্পরের আগ্রহ-অনুরাগের অভিজ্ঞতা বিনিময়, বন্ধু-বান্ধবীদের আশা-আকাঙ্খার সহমর্মিতা।

কিশোর বয়সের এ দুঃসাহসিকতা, এ উদ্দাম স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যবোধ, এ বর্হিমুখী অবাধ মেলামেশার মুক্ত দিগন্ত–সবই আতঙ্কিত করে এসেছে যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে। এ থেকেই ঘরে ঘরে জেগেছে কতই-না নবীণে-প্রবীণে সংঘর্ষ, মনোমালিন্য, বিয়োগান্ত পরিণতি। উদ্দামতার মুখে লাগাম পরানোর নির্বিচার প্রচেষ্টায় কত মর্মস্পর্শী কাহিনীই মানুষের ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে।

মানতেই হবে–এসব উদ্দাম দুঃসাহসিকতার বেগ সংহত সংযত করতে হলে দৈহিক শক্তির চেয়ে আত্মিক প্রীতিবন্ধন অনেক অনেক বেশি প্রকৃত কার্যকরী।

বিদ্রোহের বয়স আসার আগেই, বার-তের বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একেবারে বন্ধুর মতো, সেবকের মতো ব্যবহার করা একান্ত দরকার তাদের সুপথে অবিচলিত রাখতে হলে। সুকৌশলে আলোচনা করে তাদের মনের সব ক'টি দরজা খুলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এরই মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ চিন্তার আলো-বাতাস তাদের মনের মধ্যে যাবে এবং ভেতর পর্যন্ত সব চিন্তা-তরঙ্গের কার্যকলাপ সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

সংসার-পরিবারে যতই আর্থিক সঙ্কট, রোগ ব্যাধি, মনোমালিন্য থাকুক, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে বাড়িতে তা নিয়ে রাগারাগি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদির বাড়াবাড়ি অভিপ্রকাশ একেবারেই করা উচিত নয়। ছেলেমেয়েদের নিজেদের বয়ঃসন্ধির বিচিত্র উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে পারিবারিক ঐ সব রাগ, বিরক্তি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, রোগ ইত্যাদি ঘটনাবলী।

এগুলোর প্রভাব থেকে কিশোর-কিশোরীদের সম্পূর্ণ ভাবে দূরে রাখা সম্ভব না হলেও, অত্যধিক স্পর্শকাতর আবেগ-প্রক্ষোভে সৃষ্টির কারণগুলো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা চলে।

এ ব্যাপারে বড়রা বিশেষ সংযমী এবং সদা সতর্ক না হলে ছেলেমেয়েদেরও সংযমী হতে আশা করা মোটেই চলে না। তারা তো অপরিণত।

যৌন শিক্ষার প্রয়োজন ও পরিণাম

কৈশোরে যৌনতা বোধ বিকশিত হয়, এ কথা সর্বজনবিদিত সত্য এবং কৈশোরেই যত রকমের যৌন আচরণ সমস্যার সূত্রপাত হয়, এটাও অবিসম্বাদিত তথ্য। এ কারণেই কৈশোর পর্যায়ের সূচনাতেই যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক ভাবনা-চিন্তা সারা পৃথিবীতেই হয়েছে।

যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা কিশোর বয়সেই প্রারম্ভেই স্কুলের পাঠক্রমের মাধ্যমে করা উচিত, এ মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা বলেন–গভীর সহানুভূতি সহকারে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, তাদের দেহে যৌন অনুভূতির আসন্ন অভিজ্ঞতার কতখানি গুরুত্ব এবং তার সঙ্গে তাদের শরীরের মধ্যে কি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে স্কুলের পাঠক্রমে জীবন বিজ্ঞানের বিষয়টিতে বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের যৌনতার মাধ্যম নতুন জীবসত্তা সৃষ্টির রহস্য পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু মানবদেহে যৌনতার রহস্য এবং সন্তান সৃষ্টির বিষয়ে এখনও পাঠ্যবস্তু উপস্থাপনের উদ্যোগ সাহসিকতার দেখা যায়নি।

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অপরিণত বয়স্ক-কিশোরীরা যৌন রহস্যের আনুপূর্বিক তত্ত্ব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেলে তাদের যৌন আচরণ সম্পর্কিত কৌতূহলজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব রকম প্রচেষ্ঠার মধ্যে দায়িত্ব বোধ জাগবে। অর্থাৎ যৌন রহস্যের গুরুত্ব না জেনে নিছক তৃপ্তিলাভের খেলায় যৌন আচরণের অভ্যাস কিশোর-কিশোরীদের জীবনে অনেকাংশেই সংযত হতে পারে যথাযথ যৌন শিক্ষার মাধ্যমেই।

এ ধরনের যৌন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই। কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে যে যৌন অনুভূতি এবং আবেগ উন্মেষ লাভ করে, তাদের যৌন অঙ্গে এবং সর্বাঙ্গে যে নতুন পুলক অনুভূতির স্পর্শকাতরতা বিকাশ লাভ করে উঠতে থাকে, তার ওপরে তাদের নিজেদেরই স্বার্থে প্রথম থেকেই সংযম অভ্যাস করার এবং যৌন অঙ্গের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ চর্চা করার গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়াই হল যৌন শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

যৌন শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের বোঝাতে হবে যে, ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যৌনাঙ্গের মিলন খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বয়স হলে যেমন দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্যতা বিবেচনা করে কাজের ভার দেওয়া হয়, তেমনই যৌন মিলনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত বয়স হলেই সমাজে তার অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ, এ বিষয়ে, দায়িত্ব পালনের কথা না ভেবে কেবল খেলার আনন্দে মজা করতে চেষ্টা করলে ছেলেমেয়ে উভয়েই দেহে এবং মনে নানাভাবে ব্যথা পেতে পারে।

চুম্বন, আলিঙ্গন, মৃদু আদর, গভীর আদর, স্বমেহন, যৌন মেহন, যৌন মিলন– এ সকল বিষয়েই কৈশোরের প্রারম্ভে যে কৌতূহল জাগে, যেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে দেওয়া হলে তারা বুঝবে এগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। তাদের বোঝাতে হবে, এ সবই যৌন আচরণের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটি আচরণের মধ্যে যথেষ্ট সংযম আর দায়িত্ববোধ থাকা চাই, নচেৎ আঘাত বেদনার সৃষ্টি হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

এটা যেমন শেখানো দরকার যে, টফি চকোলেট লজেন্স্ খেতে ভাল লাগে, কিন্তু সেগুলো তাড়াহুড়ো করে কচমচিয়ে চিবিয়ে খেলে দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গিয়ে দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়ে যায় এবং ভালভাবে মুখ না ধুলে অবশ্যই দাঁতের ক্ষতি হয়, মাড়িও নষ্ট হয়, তেমনই যৌন চর্চার মজা থেকেও ছেলেমেয়েদের পরস্পরের ক্ষতিও কোন কোন সময় হতে পারে, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।

বিশেষ করে, মেয়েদের যৌনাঙ্গের কমনীয়তা আর তাদের দেহযন্ত্রাদির রহস্যময় জটিলতা সম্পর্কে ছেলে এবং মেয়েদের সহানুভূতি গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। দায়িত্বজ্ঞান না থাকলে মেয়েদের দেহে বিপর্যয় ঘটতে পারে যৌন মজাভেনচারের উদ্দামতায়, এ কথা যৌন শিক্ষার মধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের সকলকেই জানিয়ে রাখলে সমাজের অনেক দুশ্চিন্তা কমতে পারে।

যৌন অনুভূতির দুর্দমনীয় প্রাবল্য যে কী প্রচণ্ডভাবে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে দিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন করে তুলতে পারে, সে সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়াই একটা কার্যকরী ব্যবহারিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে গণ্য হতে পারে।

কিশোর বয়সের ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই জানতে হবে যে, তাদের দেহ এবং তাদের অনুভূতিগুলোকে স্বাভাবিক সুস্থতায় সীমার মধ্যে কাজে লাগনোই প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কিশোর-কিশোরীর কর্তব্য। স্বাভাবিক সুস্থতার সীমারেখা সম্পর্কে এ জন্যেই যৌন শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যথাযথভাবে অবহিত করে রাখা দরকার।

এসব বিষয়ে তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোনও সময়েই বড়দের সঙ্গে আলোচনা করার সূত্র খুঁজে পায় না, কারণ বড়রা এসব আলোচনা নিষিদ্ধ পর্যায়ে ঠেলে রেখে দিতেই চান। কিন্তু কিশোর-কিশোরীরা এগুলো জেনে রাখলে বড়দেরও অনেক উপকার।

অনেক কিশোর-বয়সী ছেলে মনে করে, মেয়েদের দেহের বাইরে কোনও যৌনাঙ্গ থাকে না। এর কারণ, মেয়েদের যৌনাঙ্গের আকৃতি ছেলেদের মতো দীর্ঘ লিঙ্গ বিশিষ্ট নয়। ছোটবেলায় উলঙ্গ ছোট মেয়েদের কখনও দেখে থাকলে স্বভাবতই ছেলেদের এ রকম ধারণা হতে পারে যে মেয়েদের যৌনাঙ্গ থাকে না, যেহেতু লিঙ্গ নেই। মেয়েদের যৌনাঙ্গ যে অতি কোমল এবং বিশেষ স্পর্শকাতর, এ কথাও ছেলেরা জানার সুযোগ পায় না কোনদিনও। যখন জানে, তখন হয় তো অজ্ঞাতসারে আঘাত সৃষ্টির অন্যায় করা হয়েই গেছে।

এ ভুল ধারণা এবং অপরাধ অবশ্যই অশিক্ষার অজ্ঞানতা এবং তার পরিণাম বলে মনে করা যেতে পারে। এ ধরনের অজ্ঞানতার ফলেই উপযুক্ত বয়সে যৌন আচরণে বিষম বিভ্রান্তি, ভুল বোঝাবুঝি এবং অশান্তি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ছেলেমেয়েদের এ বিভ্রান্তি এবং অশান্তি নিজেদের চেষ্টায় দূর করতে হয়, যার ফলে তারা অনেক ভাবে শারীরিক ও মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এসব সঙ্কট থেকে মুক্ত রেখে ছেলেমেয়েদের সুস্থ স্বাভাবিক ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হলে তাদের দু'ধরনের যৌনাঙ্গের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তার বিস্ময়কর কার্যকারিতা যৌন শিক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছন্দভাবে তাদের বুঝিয়ে রাখা খুবই ভাল।

কিশোর-কিশোরীদের জন্যে যৌন শিক্ষার যে পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত, তার মাধ্যমে তাদের যৌন আচরণ সম্পর্কে ভীতি সঞ্চার করার কোনও চেষ্টাই থাকা উচিত নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কারণ, যৌন অনুভূতি এবং সে সম্পর্কে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণের প্রতি আকর্ষণের স্বাভাবিকতা যে বিপজ্জনক বা অপরাধমূলক কোনও প্রবৃত্তি নয়, সে বিষয়ে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করে দেওয়াও যৌন শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ শিক্ষাকাল শৈশব থেকেই শুরু হওয়া উচিত এবং অবিরামভাবে চলতে থাকা দরকার।

যে বয়সে ছেলেমেয়েরা স্বমেহন করে থাকে, সে বয়সে যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে–স্বমেহনের কারণ, স্বাভাবিকতা এবং সংযম সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ সৎ পরামর্শ দেওয়া। অনেক ছেলেমেয়ে স্বমেহনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে নিজেদের অপরাধী, এমন কি, রোগগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত মনে করে এবং তার ফলে বিষম মনোবিকারে নিজেদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটায়। উপযুক্ত যৌন শিক্ষা এবং উপদেশের মাধ্যমে তাদের এ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ ও ভয়ভীতি থেকে অনেকখানি নিরাপদে রাখা যায়।

সদুপদেশ না পেলে মনোবিকারগ্রস্ত ছেলেমেয়েরা স্বমেহনের পাপবোধ নিয়ে উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম, পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়তেও পারে।

সুতরাং বিশেষভাবে এ কথা শিক্ষাবিজ্ঞানীদের স্মরণে রাখা একান্ত কর্তব্য যে, ছেলেমেয়েদের যৌনতা বোধ সম্পর্কে ভয়ভীতি আতঙ্ক সৃষ্টি করবে যে-ধরনের যৌনশিক্ষা, তা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। তার চেয়ে কোনও রকম যৌন শিক্ষা না দেওয়া বরং অনেক ভাল, এ কথা যথার্থই বলেছেন বিখ্যাত যৌন শিক্ষাবিজ্ঞানী মার্কিন মহিলা চিকিৎসক ডাঃ ডায়ান গেরসোনি।

অবশ্য, যৌন শিক্ষার মাধ্যমে জন্মনিরোধ পদ্ধতি শেখানোর ব্যাপারে আমেরিকার মতো প্রাগ্রসর দেশে আইনানুগ বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে। সে দেশে ১৯৪৯ সালের জেনর‍্যাল স্কুল ল এবং ১৯৬৮ সালের পাবলিক অ্যাক্ট্ অনুসারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আইনটিতে অবশ্য বলা হয়েছে, যৌন শিক্ষার ক্লাসে 'পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ বিবাহজীবনে প্রেম ভালবাসার গুরুত্ব, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের দায়িত্ববোধ, মা-বাবা হতে হলে কি ধরনের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া অবশ্যই উচিত, ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশাদি দেওয়া হয়েছে।

তবে, দুটি আইনেই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, স্কুলের মধ্যে ক্লাসে ছেলেমেয়েদের জন্মনিরোধ বিষয়ে কোনও পরামর্শ বা সে বিষয়ে কোনও তথ্য সরবরাহ করা আইনবিরোধী বলে গণ্য করা হবে।

বেশ বোঝা যায়, অভিভাবকদের সনাতন দুশ্চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমেরিকার স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্মনিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও যৌন শিক্ষা দেওয়া বেআইনী ঘোষণা করতে হয়েছে। অভিভাবকরা মনে করেন, জন্মনিরোধ শিখলে কিশোর-কিশোরীরা অবাধে

যৌন সংসর্গ করতে থাকবে এবং তাদের যৌনব্যাধি সংক্রমণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা বাড়বে, উপরন্তু সুস্থ সামাজিক বিবাহ জীবন যাপন এবং সন্তানধারণ ও প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব পালনের প্রতি আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে।

তবে, আমেরিকাতেই এ বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ এখনও আছে। ১৯৭৪ সালে ঐ দেশের বিশেষজ্ঞ মহিলা সমাজবিজ্ঞানী ডাঃ ডায়ান গেরসোনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করে এ বিষয়ে দাবি করেছেন যে, যৌন শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য অবশ্যই জন্মনিরোধ শিক্ষা– অর্থাৎ কিভাবে জন্মনিরোধ করতে হয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে, বাঞ্ছিত সন্তান সৃষ্টি করতে হয়–যে-সন্তানকে মা-বাবা দু'জনেই সত্যিই ভালবাসতে পারবে।

সুতরাং ডাঃ গেরসোনি যুক্তি সহকারেই বলেছেন যে, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অবশ্যই শিখিয়ে রাখা উচিত–কিভাবে অবাঞ্ছিত সন্তান-সম্ভাবনা নিরোধ করা যেতে পারে। কারণ, আজকাল পৃথিবীর যে সব দেশেই ছেলেমেয়েরা কৈশোর পর্যায়ে যৌন সংসর্গের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে আগেকার দিনের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা তথ্যনির্ভর সত্য।

আমাদের দেশেও শহরে গ্রামে গঞ্জে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, দরিদ্র সম্ভ্রান্ত সব রকম কিশোর-বয়সী মেয়েরাই আজকাল বিবাহের আগে প্রায়ই সন্তান ধারণ করছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে-মেয়ে দু'জনেই জন্মনিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু না জানার ফলেই তাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে।

অল ইন্ডিয়া এডুকেশন্যাল অ্যান্ড ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স অ্যাসোসিয়েশন কিছুকাল আগে ভারতের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩০০ জনেরও বেশি কিশোর-বয়সী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক সমীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, তাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ছেলে এবং ৪২ শতাংশ মেয়ে যৌন ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞানসম্মত কোনও তথ্যই সঠিকভাবে জানে না।

ঐ সমীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে যে, যৌন শিক্ষার মাধ্যমে যৌন ব্যাধি কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসার জন্য রোগীদের মধ্যে ৩০ শতাংশই হয় কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা।

এসব ব্যাপার ঘটছে, তার কারণ–কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়ে যৌন জ্ঞানের খণ্ডিত আংশিক তথ্যাদি বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রহ করে থাকে তাদের বন্ধু-বান্ধবীদেরই কাছ থেকে, যেহেতু বড়রা যাঁরা এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ, তাঁরা ছেলেমেয়েদের কাছে এসব গূঢ় তত্ত্ব সরবরাহ করতে নারাজ। স্কুল-কলেজেও তারা এসব কথা শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছুই শেখে না।

এরই ফলে, অনেক কিশোর-কিশোরী যৌন বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকাদি থেকে যৌন-কামকলার অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। এ ধরনের ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও প্রায় ৩৫ শতাংশ। সিনেমা থেকে অস্পষ্ট যৌন আবেদক জ্ঞান অর্জন করে প্রায় ৩৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে এবং বড় জোর ২০ শতাংশ কিশোর-কিশোরীর ভাগ্যে জোটে সহৃদয় অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে স্বচ্ছ স্বাভাবিক সংযত যৌন শিক্ষালাভের সুযোগ।

যৌন শিক্ষা প্রসারের পথে এ সব কারণে দুটি প্রধান অন্তরায় রয়েছে। একটি হল তথ্যের অভাব, আর অন্যটি নবীন-প্রবীণে বিশ্বাসের অভাব।

ছেলেমেয়েরা সঠিক বয়সে সঠিক তথ্য সঠিকভাবে যদি পেতে পারে, তা হলে তারা যৌনতা উন্মেষের বয়স হলে সঠিক পদ্ধতি গ্রহণে সক্ষম হয়। তথ্যের অভাবে সেটি হয় না, তারা হাতড়ে মরে, বিপদে পড়ে।

এ ছাড়া, নবীন সমাজের দায়িত্ব বোধের ওপর প্রবীণ সমাজ ভরসা রাখেন না এবং নবীন সমাজকেও প্রবীণদের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভরসা করে তাদের কৌতূহল ব্যক্ত করার সাহস অর্জন করতে শেখানো হয়নি।

এমনি বিভেদ সম্পর্ক আছে বলেই যৌন শিক্ষার উপযোগিতা সকলে উপলব্ধি করলেও কেউ এগুতে ভরসা পাচ্ছে না। অথচ এ কাজে অগ্রসর হওয়া খুবই দরকার।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে জন্মনিরোধের খানিকটা জানার কথা অবশ্যই থাকা দরকার। সে সঙ্গে তাদের আত্মসম্মান জ্ঞানের ওপরে বিশ্বাস ভরসা রেখে বোঝাতে হবে–বিবাহের পরে এ জ্ঞান কাজে লাগানোর প্রকৃত প্রয়োজন হবে। অবশ্য, বিবাহের আগে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কখনও গোপন ঘনিষ্ঠতা হলে জন্মনিরোধের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রয়োগ করারমতো অবস্থায় অনেককেই প্রায় পড়তে হয়।

অবশ্য, এ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র প্রাক্-যৌবনেই যৌন শিক্ষার কাজ শেষ হতে পারে না। প্রত্যেক নারী-পুরুষ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, তাদের জন্যও সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-সূচির সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করতে হবে বয়স্ক-জীবনেও।

এ সব শিক্ষাসূচির মধ্য দিয়ে বিবাহের শারীরিক ও মানসিক দিকগুলো উন্নত করতে পারা যায়। এমন ভাবে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃপ্রাপ্ত মানসিতা গড়ে দিতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ বিবাহ-জীবনচর্চায় আন্দাজে ভুলভ্রান্তি করার পথ এড়িয়ে চলতে পারে। না জেনে ভুল পদ্ধতিতে বিবাহ-জীবনচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই যতটা তৃপ্তিসুখ পাওয়ার কথা, তা পেতে পরে না। অনেক ক্ষেত্রে ভূলের জন্যই বিবাহিত জীবনটা শোচনীয় প্রহসনে পর্যবসিত হতে পারে।

বলতে গেলে, বিবাহের পরেই মানুষের যৌন শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োগ শুরু হয়। আর সে গুরুত্বপূর্ণ জীবনযাত্রাকে সার্থক করে তোলার জন্যই অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই চাই কিছুটা যৌন সংক্রান্ত পরামর্শ ও পথনির্দেশ। ঠিক বয়সে এ ধরনের সঠিক পরামর্শ দিতে অবহেলা করলে এ বিষয়ে কোনো শিক্ষাই বয়স্কজীবনে সর্বাঙ্গীণ সফল হওয়া আর সম্ভব হয় না। কারণ, ততদিনে এ রহস্যময় জীবন আচরণ সম্পর্কে অনেক রকম অন্ধ ভুল বিশ্বাস, সংস্কার ও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে মানুষকে অনমনীয় করে তোলে।

যৌনতা হল জীবনের মূলগত সংগঠনী সৃজনী শক্তির ভিত্তি, আর ছেলেবেলা থেকেই একে ঠিকমতো বুঝতে পারলে এবং ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বড় হয়ে সুখের সংসার গড়ে তোলা অনেকটা সহজ হয়, মানুষের স্বভাব-চরিত্র ভারি চমৎকার সহনশীল উপভোগ্য হয়ে ওঠে এবং সমস্ত জগতটা তাই নিয়ে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে থাকে।

প্রচার মাধ্যমগুলোর ভূমিকা

স্পষ্টই বোঝা যায়, কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা যৌনতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার জন্যেই সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় নানাপ্রকার আচরণ সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে। মা-বাবা অভিভাবক-অভিভাবিকা শিক্ষক-শিক্ষিকা বড়রা কেউই তেমন সহানুভূতি সহকারে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ছেলেমেয়েদের যৌন আচরণের গুরুত্ব, তার ভাল-মন্দ বিবেচনা নিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করেন না। এর কারণ, বড়রাও এ গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনার যোগ্যতা রাখেন না।

সুতরাং এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় গণশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার মাধ্যমগুলো কাজে লাগালে ভাল হয়। বেতারে বিদ্যার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যেমন প্রচারিত হয়, মহিলা মহল, ছোটদের আসর, ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠানাদি বেতার মাধ্যমে যেভাবে জনগণের কল্যাণার্থে পরিবেশন করা হয়, সেভাবে যৌনতার গুরুত্ব কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের উপযোগী করে মূল তথ্যাদি সমেত বেশ ভালভাবেই বেতার অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কেবলমাত্র বক্তৃতা নয়, কিশোর-কিশোরীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানাপ্রকার ব্যক্তিগত যৌন বিষয়ক কৌতূহলমূলক প্রশ্নোত্তর চর্চার আয়োজনও বেতার মাধ্যমে অগণিত শ্রোতার কাছে গণশিক্ষা স্বরূপ ব্যাপকভাবে পৌছে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে বেতার প্রচার কর্তৃপক্ষের একটা পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোগী হওয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

এখন টেলিভিশন ব্যবস্থায় গণশিক্ষার সে সুযোগ আরও কার্যকরী হয়েছে। কারণ আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রয়োজন মতো ছবি দিয়ে যৌন রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্য কাহিনী প্রয়োজনীয় করে প্রচার করলে তা আরও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। যৌন আচরণের মধ্যে সংযম না থাকলে তা কিভাবে ছেলেমেয়েদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, তা চমকপ্রদভাবে টেলিভিশনের মাধমেই উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

তবে টেলিভিশনের মাধ্যমে যে সব বড়দের কাহিনীচিত্র দেখানো হয়ে থাকে, সেগুলোতে প্রেমেচর্চামূলক যৌন আচরণ–যেমন, চুম্বন, আলিঙ্গন, এমন কি, শয্যাদৃশ্যে নারী-পুরুষের মিলনও যেভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, সেগুলো নিশ্চয়ই কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের সদ্যবিকশিত যৌন অনুভূতির পক্ষে যথেস্ট উত্তেজনাসৃষ্টিকারী। এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর বয়সের যৌন আচরণ সমস্যারও উদ্দীপক। এগুলো অনুমোদন বড়দের সঙ্গে বসে এক সাথেই ছেলেমেয়েরা দেখে থাকে, সুতরাং পরোক্ষভাবে বড়দের অনুমোদন লাভ করে বলেই মনে হয়।

কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের কল্পনার জগতে দিবাস্বপ্নের চর্চায় টেলিভিশনের শক্তিশালী প্রভাব দারুণ কার্যকরী হয়ে থাকে। যৌনভাবমূলক দৃশ্যগুলো নাটকে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন টেলিভিশনের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের অন্তরে প্রবেশ করে। এর ফলে তারা স্বভাবতই সে ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বাস্তব জগতে নিজের জীবনে ঐ ধরনের আচরণ প্রতিফলিত করার আকুলতা বোধ করে। টেলিভিশনের এ প্রভাব থেকে আধুনিক সভ্য সমাজ ছেলেমেয়েদের কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারছে না।

এর একমাত্র প্রতিকার হতে পারে–টেলিভিশনের ব্যবহারকারী গৃহস্থদের সংযম অভ্যাসের মাধ্যমে। ছেলেমেয়েদের মনোযোগ যাতে টেলিভিশনের সব রকম অনুষ্ঠানের দিকে নির্বিচারে আকৃষ্ট হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে বড়দেরই সংযমী হয়ে ছেলেমেয়েদের উপযোগী বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো মাত্র এক সাথে বসে দেখা উচিত। প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারে এ সুনিয়ম নীতি ছেলেমেয়েদের কল্যাণে মেনে চলতে না পারলে, কিশোর-কিশোরীদের

যৌন আচরণ সমস্যার প্রতিকারে কেবল মৌখিক নীতি উপদেশ বর্ষণ করে কোনও ফললাভ হবে না।

অবশ্য, চলচ্চিত্র বা সিনেমাও কিশোর-কিশোরীদের যৌন উত্তেজনার পক্ষে কম প্রভাবশালী নয়। কিশোরোপযোগী নির্মল আনন্দদায়ক চলচ্চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় না এবং তৈরি হলেও তা নিয়মিত ভাবে দেখানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় না বলে কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা সর্বসাধারণের প্রদর্শনযোগ্য ইউ-চিহ্নিত সিনেমাই দেখতে যায় নিয়মিত।

কিন্তু সে ধরনের প্রায় সমস্ত চলচ্চিত্রের মধ্যেই কিছু না কিছু কম-বেশি নারী পুরুষের সান্নিধ্য দৃশ্য, ঘনিষ্ঠ আচরণ দেখানো হয়– যা কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের সে ধরনের আচরণে অবশ্যই প্রলুব্ধ করে এবং বাস্তব জীবনে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের মাধ্যমে সে সব আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই রূপায়িত হতে দেখা যায়। তখন তারা বড়দের ভ্রুকুটির দ্বারা তিরস্কৃত হয়।

এমন কি, বয়স্কদের দেখার জন্য বিশেষভাবে এ-চিহ্নিত যৌনতামূলক ছায়াছবিগুলো দেখতে যাবার ক্ষেত্রেও কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা সিনেমা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও বাধা পায় না। নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থে সিনেমা কর্তৃপক্ষ বয়স্কদের জন্য এ -চিহ্নিত ছবিগুলো কিশোর-কিশোরীদেরও দেখার অবাধ সুযোগ করে দেন এবং যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বয়স্কদের জন্য ছায়াছবি কিশোর-কিশোরীদের দেখানো নিষিদ্ধ করেছেন, তাঁরাও সে বিষয়ে এ যাবৎ কোনও সুব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ দেখাননি। এ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কল্যাণকল্পে অভিভাবক সমাজকেই উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে জাগ করে তুলতে হবে।

সে সঙ্গে আরও ভাল ভাল আনন্দদায়ক কিশোরোপযোগী ছায়াছবি প্রযোজনার জন্য চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি, চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রভৃতি দায়িত্বশীল নির্ভরযোগ্য সংগঠনকে উদ্যোগী হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যবস্থাপনায় সে সমস্ত ছায়াছবি ব্যাপকভাবে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা বিশেষ প্রয়োজন, যাতে ছেলেমেয়েরা বড়দের ছায়াছবি দেখতে যাবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করতে না পারে।

এ বিষয়ে, অবশ্যই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা কোনও দিনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদ্যোগী হবেন না। কিশোরোপযোগী চলচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন দেশের কিশোর ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, নান সময়ে কিন্তু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা নীতিগতভাবে সে দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও ব্যবসায়িক বিচারে অগ্রসর হতে বিশেষ সাহসী হতে পারেন নি। সুতরাং দেশের কিশোর সমাজের এবং জাতির ভবিষ্যতের কল্যাণ-স্বার্থে এ দেশের কল্যাণ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার শিক্ষা বিভাগেরই উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছায়াছবির মাধ্যমে যৌন আচরণমূলক সমস্যার কাহিনীচিত্র ছেলে-মেয়েদের সামনে পরিবেশন করতে পারলে খুবই সুফল লাভ করা যাবে। ঐ সব চলচ্চিত্র আধুনিক ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্কুল-কলেজে কিশোর-তরুণ বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে 'দেখানোর ব্যবস্থা করলে তারা অনেক উপকৃত হবে এবং যৌনতা সম্পর্কে সঠিক ভাবধারা গড়ে তুলতে পারবে।

যৌনতত্ত্ব বিষয়ক নানা ধরনের তথ্যচিত্রও ঠিক এভাবে ভিত্তিও-র মাধ্যমে কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়মিত দেখালে তারা আনন্দের মাধ্যমে প্রকৃত যৌন শিক্ষার আস্বাদন পাবে এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিকৃত খণ্ডিত অর্ধসত্য আহরণ করে বিভ্রান্ত হওয়ার কবল থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতে পারবে। সে ছবিগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত হতে পারে।

বেতার টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র ছাড়াও অন্য একটি প্রচার মাধ্যম স্কুল-কলেজে পড়া কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের খুবই আকর্ষণ করে থাকে, তা হল বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা। দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর দৈনন্দিন সংবাদ-সমাচার এবং বিশেষ করে

খেলাধূলার পৃষ্ঠাগুলোর প্রতি কিশোর কিশোরীদের এতই আগ্রহ দেখা যায় যে, প্রায়ই তারা সে পৃষ্ঠাটি কাড়াকাড়ি করে পড়তে চায়।

তাই, এসব পত্রিকায় কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিভাগের জন্য একটি পৃষ্ঠা নির্ধারিত করে রাখলে তার মাধ্যমে অন্যান্য সাহিত্য পরিবেশনার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যৌন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দে পরিবশেন করা চলে। তাতে পত্রিকার জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পাবে, দেশের কিশোর সমাজও তেমনি উপকৃত হবে।

তবে, এসব দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি যৌন অপরাধমূলক ঘটনাগুলো এমনই বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হয়, যা সাংবাদিকতার বিচারে খুবই বিশ্বস্ততার লক্ষণ হলেও, ঐ ধরনের সংবাদ উপস্থাপনা কিশোর-কিশোরীদের নির্মল হৃদয়ে নিশ্চয়ই কলুষতা এবং যৌনতা সম্পর্কে দারুণ বিভীষিকাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে।

এ কারণে, সংবাদপত্রের সম্পাদক সমাজের কাছে কিশোর-কিশোরীদের পক্ষ থেকে অভিভাবক সম্প্রদায় যদি অনুরোধ জানাতে পারেন, তা হলে জনস্বার্থের খাতিরে এবং কিশোর কল্যাণকল্পে ঐ ধরনের কলুষতাময় সংবাদগুলো পরিবেশনে সংযমী হতে পারেন সংবাদপত্রগুলো।

অনেক সময় দৈনিক সংবাদপত্রে এবং কোনও কোনও সাময়িক পত্রিকাতেও যেন তেন প্রকারে পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপনের ছবিতে নারী-পুরুষের যৌন উত্তেজক ছবি ছাপা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা বলেই থাকেন যে, বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করতে হলে তাতে কিছুটা যৌন আবেদন থাকা দরকার।

বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের স্বার্থে সে নীতি যতই গ্রহণযোগ্য এবং শিল্প-ব্যবসায়িক মনোবিজ্ঞান সম্মত বলে স্বীকার করা হোক্ না কেন, কিশোর-কল্যাণ স্বার্থে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ দরকার।

এ নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিভাবক সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাবি উপস্থাপন করলে সত্যি কাজ হবে। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক-সমাজের নীতিবোধ জাগানোর জন্য এ ধরনের সামাজিক চাপ সৃষ্টি করার দরকার আছে, মনে হয়।

সংবাদপত্র ছাড়াও, আরও রকমারি সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও যৌনআবেদক ছবি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সেগুলোও কিশোর-বয়সী ছেলেমেয়েদের যৌন অনুভূতির পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। সেসব পত্রিকা ছেলেমেয়েদের কাছে না আনাই মঙ্গল।

অনেক সময়ে সম্পূর্ণ যৌন-বিষয়ক পত্রিকাও ছেলেমেয়েদের নজরে এসে পড়ে। সেগুলো তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে অনেকখানি, কিন্তু যৌন অভিজ্ঞতা লাভের আকুলতা বাড়িয়ে তোলে তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কারণে কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে ঐ ধরনের যৌন পত্রিকা যাতে না পৌছায়ে, সে বিষয়ে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী পৃথক ধরনের সাহিত্য পত্রিকা অবশ্য নানা ধরনের প্রকাশিত হয়। সেগুলোর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের উপযোগী যৌনতত্ত্ব কতখানি পরিবেশন করা যায়, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

অবশ্য কিশোরদের জন্য পত্রিকা অনেক সময়ে খুব ছোট শিশু এবং ছেলেমেয়েরাও পড়ে। সে জন্য তাতে যৌনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা বা ছবি প্রকাশিত হলে তা বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েদের বোধসীমার অন্তর্গত হল কি না তা যথাযথভাবে সম্পাদনার পর প্রকাশ করা উচিত।

তবে যৌন উত্তেজনা প্রশমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিশোরদের পত্রিকাগুলোতে যোগাসন শিক্ষা, নানা ধরনের খেলাধূলা ও বিধিবদ্ধ জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত নিবন্ধাদি পরিবেশন করলে কিশোর সমাজের প্রকৃতি কল্যাণ সাধিত হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

সমাজের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব

কিশোর-কিশোরীদের যৌন আচরণ সমস্যার কথা উঠলেই সচরাচর ছেলেমেয়েদেরই অসংযত আচরণের নিন্দা-মন্দ করে থাকেন সমাজের সকলেই। কিন্তু অপরিণত ছেলেমেয়েরা যৌন আচরণমূলক সমস্যাসঙ্কটের পথে পা বাড়াল কেন, সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সামগ্রিকভাবে সমাজের নেতৃস্থানীয় সকলকেই। সমাজকে ঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব যাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে তাঁদেরও কিছু করণীয় অবশ্যই আছে, সে কথা মানতেই হবে।

সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও আজ শহরে গ্রামে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকল স্তরে নারী প্রগতি তথা নারী মুক্তি আন্দোলনের হাওয়া যেভাবে নব্য সংস্কৃতির বিজয়কেতন উড়িয়েছে, তার ফলে নবযৌবনা কিশোরীরা উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি চর্চা প্রভৃতি কাজে কিশোর তরুণদের সঙ্গে প্রায়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে চলাফেরার সুযোগ পেয়েছে।

আগেকার সমাজে এতটা মেলামেশার সুযোগ ছিল না। আজ যখন কিশোর-কিশোরীদের দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশায় এত বেশি সুযোগ করে দিয়েছে সমাজ, তখন তার পরিণামে পারস্পরিক আকর্ষণ বোধ আর যৌনতার কৌতূহল জাগবে, এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছুই নেই।

এমন একদিন ছিল, যখন মেয়েরা পর্দানশীন থাকত। পরে মেয়েদের জন্য বাসে গাড়িতে আসন সংরক্ষণ শুরু হল। বাইরের জগতে তাদের পদচারণা বাড়তে দেওয়া হল। রাজনীতির নেতারাও এ সুযোগ নিয়ে মেয়েদের প্রগতির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন বলে তাঁদের মিছিলের পুরোভাগে দিলেন মেয়েদের স্থান। বাইরের জগতে মেয়েরা পেল মর্যাদার আসন।

এ মর্যাদা সমাজের সব মানুষই দিয়েছে মেয়েদের। তারা সে স্বাধীনতার মর্যাদা কাজে লাগিয়ে এক পা এক পা করে অনেকখানি পথই এগিয়ে গেছে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সঙ্ঘ-সংগঠনে, সঙ্গী নির্বাচনে, দেশ-শাসনে মেয়েরা আজ সমাজের উদার ব্যবস্থাক্রমে তাদের জীবন গঠনে নিজেদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

সমাজের এমনি মুক্ত পরিবেশে মেয়েরা কিশোরী বয়সে তাদের সহজাত যৌনতার আচরণ চর্চাতেও কিছুটা স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করতে চাইছে বলেই মনে হয়। তাই, তারা কিশোর সঙ্গীদের আকৃষ্ট করলে ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই– সমাজের স্বীকৃতি তাদের স্বপক্ষে অনেকদিন আগেই মঞ্জুরীকৃত হয়ে আছে।

এ সূত্রে সমাজের আইনজ্ঞদের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁরা যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধকরণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সে আইনটির তাৎপর্য এ যে, স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে পৃথক হয়ে আবার বিবাহ করতে পারেন।

এর পরিণামগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান চিন্ত্যনীয় বিষয় যা সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে, তা হল– ছেলেমেয়েদের কাছে বিবাহের গুরুত্ব নাকি বিশেষভাবে কমে

যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বলতে শুধু যৌনতার গুরুত্বই যেন প্রাধান্য লাভ করেছে। এর জন্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বহুলাংশেই দায়ী বলে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করে থাকেন।

এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, কোনও শিক্ষিতা মহিলা দু'টি সন্তান ধারণ করার পরেও বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দিয়ে অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করেছেন। তা হলে সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ অনুসারে মনে করা যেতে পারে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাস্বাধীন বহুকামিতার পথ যেন একভাবে সহজলভ্য করেই দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতার ওপরে এর প্রভাব অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তারা বিবাহ-জীবনে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে বিবাহ-জীবনের বাইরে থেকেই যতটা সম্ভব যৌনতা চরিতার্থ করে নেওয়াটাই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রূপে সমীচীন বোধ করছে বলে অনেকের আশঙ্কা জাগছে।

এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভারসিটির সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিতা অধ্যাপিকা জেসী বারনার্ড সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তাঁর সাম্প্রতিক একখানি গ্রন্থে (দ্য ফিউচার অব ম্যারেজ) স্পষ্টভাবেই তাই লিখেছেন যে, অধুনা সামাজিক রীতিনীতি আইনকানুন এমনই হয়েছে যে, কিশোর-কিশোরীরা বিবাহ জীবনে আবদ্ধ হয়ে নানা রকম জটিলতায় অহরহ নিপীড়িত হওয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে যৌনচর্চা করে জীবন কাটানোর 'গণতান্ত্রিক' অধিকার পেতে চাইছে বলে মনে হয়।

সমাজে নারী স্বাধীনতার যাঁরা প্রবক্তা, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রণয়নে যাঁরা পথিকৃৎ, কিশোর-কিশোরীদের যৌন আচরণ সমস্যার উদ্ভবে তাঁরা অনেকাংশেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছেন বলেও সমাজ-বিজ্ঞানীদের একাংশের ধারণা। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যে ধরনের মানসিকতা কৈশোর ও তরুণ পর্যায় থেকে গড়ে তুলতে পারলে বয়স্ক জীবনে দায়িত্ববোধ জাগে আর তার ফলে বিবাহ জীবনে সংহতি সৃষ্টি হয়, সমাজ জীবনে সামগ্রিক সুশান্তি বিরাজ করে, নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রণেতারা সে মানসিকতায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে পেরেছে কতখানি, সে বিষয়ে কোনও কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আজ সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

এ বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব আজও যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন না। সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, সনাতন সমাজ রীতির বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমগ্র নারী-পুরুষ জাতিকেই গিনিপিগ রূপে পর্যবেক্ষণ-মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগিয়ে চলেছেন।

স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার দাবিতে আজ বহু গৃহস্থ পরিবারে নারী-পুরুষের মধ্যে বিষম ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা সে মানসিক নিপীড়নের মধ্যে যে দুর্বিষহ ভাবধারা নিয়ে বড় হয়ে উঠছে, তা নিশ্চয়ই তাদের কিশোর-তরুণ জীবন-পর্যায়ে করুণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সুতরাং কিশোর-কিশোরীরা যখন তাদের যৌনতা উন্মেষকালে স্বাধীনতা চাইবে, তখন মা-বাবা হয়েও যে কী পরিমাণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের সামনে বিকৃত আদর্শ স্থাপন করার মাধ্যমে, তা নিশ্চয়ই চোখের জলে বুঝতে পারবেন। কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকে না, কারণ বিষবৃক্ষে ফল ধরে গেছে।

মেয়েদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ করে দেবার ব্যাপারেও সমাজ নেতাদের দায়িত্ব পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যদিও মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স আইনত নির্ধারিত হয়েছে আঠার বছর, তবু দেখা যায়, তথাকথিত গণতান্ত্রিক নারী স্বাধীনতার বাতানুকূলে কিশোরী মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালের পনের-ষোল বছর পেরুবার

আগেই স্কুলের ছাত্রী-জীবন পর্যায়ের মধ্যেই যৌনতার অভিজ্ঞতা অর্জনে বেশ অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্কুলের ছাত্রীরা সন্তান সম্ভবাও হচ্ছে এবং আঠার বছরের নিম্নবয়স্ক বহু মেয়ে গর্ভপাত ক্লিনিকে যাচ্ছে মানমর্যাদা রক্ষার জন্য।

এ থেকে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিবাহের বয়স নির্ধারণ করে দিয়ে সমাজ-নেতারা যে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে নানা প্রকার সারবান যুক্তিতত্ত্ব উপস্থাপন করে থাকেন, সে দাবি এখনও হয় তো কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ।

কারণ, প্রকৃতির সনাতন শাশ্বত ইঙ্গিত উপেক্ষা করে, মূলত শুধুমাত্র আপাতগ্রাহ্য বিবেচনায় প্রবর্তিত ঐ বিধিনিষেধ আজ কিশোরী মেয়েদের উপযুক্ত বয়সের ধর্ম অনুযায়ী সহজাত প্রাকৃতিক দাবি মেটানোর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এবং পরিণামে প্রকৃতির তাড়নায় সংযমের যথার্থ শিক্ষার অভাবে অপরাধমূলক যৌন আচরণে মেয়েরা অসহায় অবস্থায় পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হচ্ছে।

আঠার বছরের কম বয়সে মেয়েদের বিবাহের ফলে সন্তান ধারণ করলে স্বাস্থ্য হানি হওয়ার যুক্তি স্বীকার করা গেলেও প্রশ্ন থেকে যায় এ যে, তার আগে যৌন আচরণের আকুলতা যখন সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় কিশোরী মেয়েদের জর্জরিত করতে থাকে, তখন সে বিষয়ে সংযম অভ্যাসের সুশিক্ষা সম্পর্কে সমাজ-নেতারা কতখানি ভাবনা-চিন্তা এবং পথনির্দেশ করেছেন। এ জন্য উপযুক্ত যৌন শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের এ বিষয়ে সংযমের যৌক্তিকতা বোঝানোর ব্যবস্থা রাখা একান্তই দরকার। সে সঙ্গে দরকার যৌন উত্তেজনামূলক প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

ঠিক যে বয়সটাতে নারী-পুরুষের মিলন-আকাঙ্ক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির সূচনা অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে, সে বয়সের সবটাই তাদের অনভিজ্ঞতার অন্ধকারে কাটাতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমাজ-নেতারা এ ব্যাপারে যেন হৃদয়হীন নির্বিকার দর্শক হয়েই আছেন।

সমাজের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে সমালোচনার যোগ্য। বিশেষ করে, পোশাক ব্যবসায়ীদের কথাই ধরা যাক। রকমারি চটকদারি পোশাকের বাহারে মেয়েদের সাজানোর ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় এমন ধরনের ডিজাইনের পোশাকাদি তৈরি এবং বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যেগুলো উঠতি বয়সের ছেলেদের চোখে মেয়েদের আকর্ষণ স্বভাবতই বাড়িয়ে তোলে।

মেয়েদের পোশাকের এ ধরণ ও ফ্যাশন সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় নানা প্রকার বিরুপ সমালোচনামূলক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজে যৌন উত্তেজক পোশাকের প্রচলন বাড়ছে বৈ করছে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেয়েদের জন্য ভি (গ) আকৃতির স্কার্ট যৌনাঙ্গের সামনে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে তাদের যোনি প্রদেশের অবস্থান ও তার ত্রিকোণ আকৃতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অবশ্যই প্রকটিত হয়ে ওঠে।

অনেক মেয়ে এমন আঁটিসাঁট পোশাক পছন্দ করে, অথবা লোকচক্ষে তাদের মোহিনীরূপে তুলে ধরার সুপরিকল্পিত ইচ্ছেতেই মায়েরা নিজেরাই তা পছন্দ করে দেন, যা তাদের বক্ষদেশ, নিতম্ব ইত্যাদি যৌন উত্তেজক মনোমুগ্ধকর অঙ্গগুলোকে ছেলেদের সামনে উদ্ভিন্ন করেই রাখে। অনেক পোশাক-ব্যবসায়ী নানা ধরনের বর্ণালী কাঁচুলি বা বক্ষ-আবরণী এমন পদ্ধতিতে তৈরি করে বিক্রি করে, যা মেয়েদের পয়োধর সু-উন্নত করে দেখায় এবং ছেলেদের দৃষ্টি দারুণভাবে আকর্ষণ করে, মন চঞ্চল করে তোলে।

এছাড়া, মেয়েদের কিছু কিছু অনাবৃত অঙ্গ-লাবণ্য ও কমনীয়তা বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, এ কথা জানা সত্ত্বেও লো-কাট এবং ভি-কাট ব্লাউজ পরা, নাভির নিচে শাড়ি পরা এবং অন্যান্য ধরনের উগ্র বর্ণের রকমারি পোশাক পরা

আজ নারী সমাজে এতই ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়ও হয়েছে যে, কিশোর বয়সের ছেলেদের মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, একথা সমাজের সমস্ত অভিভাবক, বিশেষত অভিভাবিকাদেরই, উপলব্ধি করা উচিত বলে মনে হয়।

এগুলো নিশ্চয়ই কিশোরী মেয়েরা নিজেরাই উদ্ভাবন করে না, তৈরিও করে না, কিংবা বিক্রি করতে বের হয় না। সমাজের যাঁরা রুচি নির্ধারণ করেন, ফ্যাশন প্রবর্তন করেন, সে সব সংস্কৃতিমনা শিল্পশ্রষ্টা, পেশাকের ডিজাইনার এবং সব শেষে বিপণনকারীরাই এর প্রচলন করেন, আর ব্যাপকভাবে সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন কিশোরী মেয়েদের অভিভাবকেরা।

এ কারনে বলতে হয়, সমাজের রুচিসম্পন্ন সম্প্রদায় বলে যাদের ওপর কিশোরী-মেয়েদের পোশাক তৈরি এবং মনোনয়নের ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাঁরাই তাদের পোশাক এবং সাজসজ্জার রুচি এমন উগ্রভাবে গড়ে দিচ্ছেন, যার পরিণামে কিশোরী-মেয়েরাই পণ্য-সামগ্রীর মতোই চটকদার হয়ে উঠছে কিশোর-বয়সী ছেলেদের চোখের সামনে।

সুতরাং এ কথা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই উপস্থাপন করা চলে যে, মেয়েদের পোশাক এবং সাজসজ্জার এ চটকাদারিতা আজকের সমাজে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌন আচরণ সমস্যায় প্ররোচিত করে তোলার অন্যতম অবশ্যম্ভাবী কারণ বলতেই হবে, এবং সে প্ররোচনায় প্রকারান্তরে নিত্যনতুন ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন সমাজেরই দায়িত্বশীল একাংশ।

প্রায় ষাট বছর আগে আমেরিকায় ডাঃ অ্যালফ্রেড কিনসী নরনারীর যৌন আচরণ সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল নিরীক্ষা ও গবেষণা করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ ধরনের পোশাকের ব্যবহারকেও তিনি এক ধরনের সন্নিকৃষ্ট (প্রক্সিম্যাল) যৌন ক্রিয়াকলাপেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছিলেন।

সন্নিকৃষ্ট যৌনতা বলতে বোঝায়–

১) যা যৌন অনুভূতি জাগায়,

২) যৌন আচরণের উপচার রূপে কাজ করে,

৩) যৌন আচরণের বিকল্প তৃপ্তি জাগায়, কিংবা,

৪) প্রত্যক্ষ যৌন আচরণের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, কারণ, ঐ ধরনের সুকৌশলে তৈরি পোশাক পরলে যৌন উত্তেজক অঙ্গ বিশেষ প্রকটিত হয়ে, এমন কি, সম্পূর্ণ নিরাবরণ নারীদেহেরই বিকল্প রূপরেখা প্রদর্শিত হয়ে, প্রত্যক্ষ যৌন ক্রীড়ার মতোই ছেলেদের মনে অবশ্যই উন্মদনা সৃষ্টি করে।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে একেই প্রদর্শকাম (এক্জিবিশ্যনিজ্‌ম্) আচরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্যবসায়ী সমাজ এ ধরনের বিকল্প সন্নিকৃষ্ট কামচর্চায় ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে এবং মায়েরাও ফ্যাশন-মুগ্ধ হয়ে এ কাজে অর্থানুকূল্য দেখাচ্ছেন।

কিশোরী মেয়েদের মধ্যে যৌন আচরণ সমস্যার ব্যাপকতা ইদানীং যেভাবে প্রসার লাভ করেছে, তা থেকে সমাজ ব্যবস্থার অন্য একটি গুরু-দায়িত্বের কথা স্বভাবতই মনে আসে, তা হল বিবাহে পণপ্রথার দুশ্চিন্তা।

মেয়েরা যৌন চেতনা অর্জন করার সময় থেকেই বিবাহ চিন্তা শুরু হয় তাকে ঘিরে। তখন থেকেই কিশোরী মেয়েরা বুঝতে থাকে– বিবাহের জন্য পণ প্রথা অনুযায়ী বিপুল অর্থ সংগ্রহে অভিভাবক অভিভাবিকারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই অনেক মা-বাবা উঠতি বয়সের মেয়েদের শুনিয়ে থাকেন–মেয়ের বিবাহে মা-বাবার কত দুশ্চিন্তা।

এসব শুনতে শুনতে এবং সমাজের আবহাওয়া অনুধাবন করতে করতে কিশোরী-মেয়েরা মা-বাবার প্রতি সহানুভূতির বশে নিজের অপরিণত বুদ্ধি-কৌশলের

সাহায্যে এমন কিছু করতে পারার কথা ভাবতে থাকে, যার ফলে তারা মা-বাবার দুশ্চিন্তা লাঘব করতে পারে। তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে কর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করতে চায়– সে পথেও উপলব্ধি করে অর্থব্যয়ের দুশ্চিন্তা, আবার, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও দেখতে পায় বেকার সমস্যার পর্বতপ্রমাণ বিভীষিকা।

এসব কিছু দেখতে দেখতে মেয়েরা মনে করে–মা-বাবা এ বিপুল সমস্যার সমাধানে যখন এতই ভারাক্রান্ত বোধ করছেন, তখন নিজের চেষ্টায় নারীসুলভ আকর্ষণ কাজে লাগিয়ে মনের মতো কোনও ছেলের সাথে জীবনের বন্ধন গড়ে তুলতে পারলেই বুঝি মা-বাবা তার বিবাহ সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার কবল থেকে, বিবেকের অহরহ দংশন থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতি বিষয়ক পরিকল্পনা-প্রকল্পনাদি রচনার দায়িত্ব যাঁদের কাছে আছে, তাঁদের এসব সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বিশেষ দরকার, যাতে ঘরে ঘরে আর্থিক দুশ্চিন্তার পরিণামে অপরিণত-বয়স্ক কিশোর-কিশোরী তাদের সীমিত বুদ্ধি-অভিজ্ঞতায় বিভ্রান্ত হয়ে নানা রকম আচরণ-সমস্যায় নিজেদের এভাবে জড়িয়ে না ফেলে।

তেমনই, শিক্ষা ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সমাজে যাঁরা বহন করছেন, তাঁদেরও গভীরভাবে অহরহ বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য যে, শিক্ষাক্রমে কোথাও নিশ্চয়ই গলদ আছে, যার পরিণামে কিশোর-কিশোরীরা সঠিক পথনির্দেশ না পেয়ে আচরণ সমস্যার শিকার হয়ে পড়ছে। শুধুমাত্র যৌন শিক্ষা নয়– সৃজনশীর্ল শিক্ষার সুস্থ সুনিয়মী আচরণগুলো কিশোর-কিশোরীদের চর্চার অবকাশ দিতে পারা যায় কিনা, চেষ্টা করা যেতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে আজ বাধ্য হয়ে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য এ যে, এ সব উদ্যোগের প্রায় সবই হল যৌনশিক্ষা বিবর্জিত। অর্থাৎ যৌন সংযমের কোনও শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র আয়োজনও তাতে নেই। অথচ আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এ উপমহাদেশের ব্রহ্মচর্য মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালের অনেক আগে থেকেই যৌন সংযমের কতই না নীতি-নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।

যে সব কিশোর-কল্যাণকর সঙ্ঘ সংগঠন ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য স্কুলপাঠ্য সহায়ক (কো-কারিক্যুলার) বিবিধ কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে, সেগুলোর মাধ্যমে সমাজে সদভ্যাসগুলোর কিছু কিছু চর্চা করা খুবই সম্ভব। তবে, সে উদ্যোগে মা-বাবা অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজ-নেতা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সার্বিক সমাজ সহযোগ একান্ত প্রয়োজন, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান যুগের মানুষের জীবনধারা নিয়ে অন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এক্সপেরিমেনটের মতোই অবশ্য একটা নতুন আওয়াজ উঠেছে–যৌন স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। এর পরিণামে যে লাগাম-ছেঁড়া একটা বিস্ফোরক সমাজ গড়ে উঠছে, তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে বেশ পাওয়া যাচ্ছে।

তাই, সে ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা উদায়স্ত এমনই সুষ্ঠু কর্মধারায় সদাব্যস্ত থাকবে, যার মাঝে যৌন অভিলাষ চরিতার্থ করার মতো ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধারণের প্রবৃত্তি জাগার সুযোগ তাদের থাকবেই না।

অভিজ্ঞ শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে, শিক্ষাচর্চা কেন্দ্রগুলোতে সব রকম পাঠ্য বিষয়ের নিয়মিত অনুশীলন এবং নানা ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজকর্মের এমন পূর্ণাঙ্গ ঘনসিন্নবিষ্ট আদর্শ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়, যার মাঝে শিক্ষার্থীরা কোনও প্রকার অসংযমী যৌন আচরণ চর্চার ইচ্ছা করতেই পারে না।